দহনক্ষুধা

অঙ্কুর বর

দহনক্ষুধা

দহনক্ষুধা

অঙ্কুর বর

বিভা পাবলিকেশন

উ। ৎ। স। র্গ

এতদিন ধরে সোস্যাল মিডিয়ায় লেখা গল্পে পাঠকদের থেকে
পাওয়া প্রত্যেকটি মতামতকে — যা আমার লেখনিকে
প্রতিনিয়ত পরিণত করে চলেছে।

ভূমিকা

প্রথম বই হিসেবে আমার কী ভূমিকা লেখা উচিত তা সত্যি আমার জানা নেই। সত্যি জানা নেই, কী কী লিখলে একটা ভূমিকা ঠিকঠাকভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু লিখতে তো হবেই। তেমনই নাকি নিয়ম। কী লিখব? কী লিখব? সাত পাঁচ ভেবেও যখন কোনো কূল কিনারা পেলাম না তখন মনে হল 'দহনক্ষুধা' সম্পর্কেই দু লাইন বলা ভালো। কথায় আছে না? সেফ খেলাটাই বেস্ট!

স্বর্গ নরকের concept বা ধারণাটা বড্ড বেশি গোলমেলে। কোনটা স্বর্গ, কোনটা নরক বা এদের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা সেই নিয়ে যুগযুগ ধরে অনেক বিতর্ক, অনেক চুলোচুলি। অনেক যুক্তিনির্ভর তাত্ত্বিক আলোচনাতেও যখন বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারেননি। তখন আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কী করণীয়? তখন তারা নিজেদের মতো করে একটা কনসেপ্ট বানিয়ে ফেলে। আমিও তাই বানিয়েয়েছি। আর সমগ্র 'দহনক্ষুধা' জুড়েই সেই কনসেপ্টকে ভিত্তি করে ছুটেছি, বসেছি, হেঁটেছি, গড়াগড়ি দিয়েছি। আর আমার কনসেপ্টটা কী শুনবেন? না থাক, তার জন্য তো গল্পটা রইল...

যিনি প্রায় আমার পেছনে পড়ে থেকে, কান ঝালাপালা করে আমার থেকে এই লেখাটি বের করেছেন তাঁর কথায় এবার আসা যাক। সুমঙ্গলদা তোমায় কুর্নিশ। তুমি না থাকলে সত্যি বইটা বের হত না। ও হ্যাঁ, আরেকজন আছে। একটা বাচ্চা ছেলে। তবে আমার মতো অন্ধের যষ্টি সে। উৎসব চৌধুরী, তোমার নাম এই ভূমিকায় না নিলে পাপ হত। ব্যস! এটুকুই বলবার। ভালো থাকিস/থেকো/থাকবেন সবাই।

(১)

।। জীবন্ত সমাধি।।
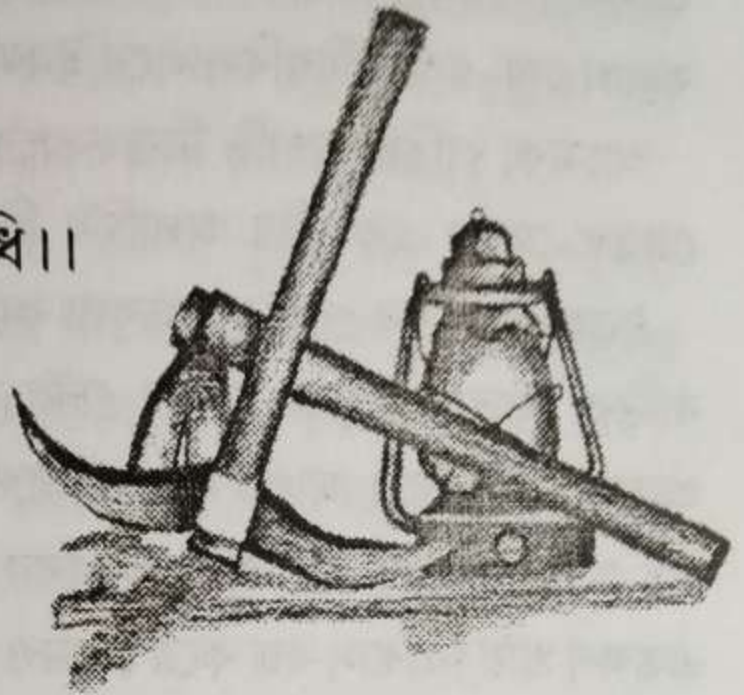
গ্রামটির নাম কাঞ্জাং। সিকিমের একটি অতি ছোট্ট অপরিচিত গ্রাম যার জনবসতি সাকুল্যে কুড়িটি পরিবার। পাহাড়ের ধাপ কেটে বানানো এই গ্রামটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে রয়েছে রঙিন কাপড়ের টুকরো। পাইন আর ওক গাছের ঘন সবুজ আস্তরণে ঢাকা কাঞ্জাঙের নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যি মনোহর। একদিকে উঁচু পাইনবনের ফাঁক থেকে দৃশ্যমান কাঞ্চনজঙ্ঘা আর অন্যদিকে পাহাড়ি ঝোরা।

কাঞ্জাং গ্রামটি মূলত হোমস্টের ব্যাবসা নির্ভর। পাহাড়ের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এই হোমস্টেগুলিই পর্যটকদের আপদকালীন আশ্রয়স্থল। টাকার বিনিময়ে টুরিস্টেরা এই হোমস্টেগুলোতে থাকা খাওয়া দুইই পায়। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ার জন্য গ্রামটিতে টুরিস্টের পরিমাণও কম। তাই এখানকার লোকেদের অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়। কিন্তু তবুও এরা সুখী। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাই ছিল।

কার্তিকের মাঝামাঝি, পাহাড়ে শীত পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। রাত্রি বারোটা পাঁচ। গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। শীতকাল পড়লেই সন্ধ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়াই এখানকার লোকেদের অভ্যাস। কিন্তু আজ রাতে গ্রামের শেষ ঘরটি থেকে বন্ধ দরজা জানালার ফাঁক গলে মৃদু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই ঘরের মালিক নবীন শেরপা বহুদিন আগেই গত হয়েছেন। নবীন শেরপার ছেলে আর বউমাও মারা গিয়েছেন বহুদিন হল।

তাঁর বিধবা স্ত্রী শেলি আর নাতি খাইসান শেরপা আপাতত এই ঘরের

বাসিন্দা। খাইসানের এক যমজ ভাই আছে— বোরহান। মেধাবী ছাত্র বোরহান কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্সে মাস্টার্স পড়ছে।

আচমকা রাত্রির পাহাড়ি নিস্তব্ধতাকে খান খান করে নবীন শেরপার ঘরের ভেতর থেকে এক তীব্র অপার্থিব চিৎকার ভেসে এল।

এতক্ষণে ঘরের ভেতর অন্ধকার করে, জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ির ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল নেইনি ডোনজে। হঠাৎ এই আচমকা চিৎকারে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল সে। শুধু কি সে একলা? না, এই গ্রামের প্রত্যেকটা অন্ধকার ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মহিলারা যারা এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে কোনও এক ভয়ঙ্করের অপেক্ষা করছিল, তারা সকলেই ভয়ে কেঁপে উঠল। হ্যাঁ! আজ এই গ্রামের একজনও ঘুমোয়নি।

হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ ভেসে এল। খুলে গিয়েছে নবীন শেরপার বাড়ির সদর দরজা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একটা জনা পনেরোর পুরুষের দল। যার মধ্যে সাত আটজন একটা চটের থলেতে কাউকে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে কাঁধের ওপরে তুলে ধরেছে। একটা চাপা গোঙানি আর হাত-পা ছোঁড়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চলছে সেই বদ্ধ থলের ভেতরে। দলের প্রত্যেকের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে রয়েছে। তারা একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্রুত বাঁ দিকের পাকদণ্ডী ধরল।

সামনের দিকে একটি লোক বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্রের শ্লোক আওড়াচ্ছিল। আর পেছন থেকে একটি লোক সেই চটের বস্তার ওপরে বার-বার একটা তরল গোছের কিছু ছিটিয়ে দিচ্ছিল হাতের পাত্র থেকে। দলে আরও কিছু লোক ছিল যারা হ্যারিকেন ছাড়াও কাঁধে কোদাল, শাবলের মতো জিনিস নিয়েছিল।

তারা তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। কিন্তু পাকদণ্ডীটি সরু আর শ্যাওলা ঢাকা হওয়ায় তারা থেমে থেমে নামছিল। এই পথ ধরে তাদের অনেকটা নামতে হবে। প্রায় আধঘণ্টা পরে তারা পাকদণ্ডী ছেড়ে ঝোরার (পাহাড়ি নদীর) তীর বরাবর হাঁটা শুরু করল। এখানে চাঁদের আলো একেবারেই আসছে না। মাথার ওপরে ঘন পাইন পাতার আস্তরণ দিনের বেলাতেই জায়গাটা বেশ অন্ধকার করে রাখে। ওরা নদীর তীর বরাবর হাঁটলেও একটা

পথ দেখতে পেয়েছে। পাথর দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহৃত হওয়ার ফলে আগাছায় পরিপূর্ণ। ওরা সবাই সাবধানে পথ হাঁটছিল। বস্তায় বন্দী জিনিসটা এখন আর নড়ছে না। কে জানে জ্ঞান হারাল কিনা!

হঠাৎ দলের সামনের জন থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই পুরো দলটা দেখতে পেল একটা মরচেধরা ভাঙা লোহার গেট তাঁদের পথ আটকে দিয়েছে। হ্যারিকেনের আলোয় তাদের ভয়ার্ত মুখগুলো আরও শুকিয়ে গেল যেন।

— "কে হামি জাঙ্গাও?"(আমরা কি ভেতরে যাবো?) দলের মধ্যে থেকে একটি লোক বিড়বিড় করে প্রশ্নটা করতেই সামনের জন মাথা নাড়াল। হ্যাঁ, তাদের ভেতরে যেতে হবে।

* * * * * * * * * *

বাড়ির সদর দরজায় জোরে শাবলের একটা বাড়ি মারতেই মরচে পড়া শিকলটা ভেঙে একদিকে ঝুলতে লাগল। হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, চারিদিকে ধুলোর পুরু আস্তরণ। সামনের দিকের লোকটি সম্ভবত তান্ত্রিক গোছের কেউ। হাবভাব দেখে তাঁকে এই দলের প্রধান বলেই মনে হচ্ছিল। তিনি মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর তাঁর পেছনে পেছনে পুরো দলটা। অন্ধকার ঘুটঘুটে হয়ে আছে ভেতরটা। সেই সাথে একটা চাপা ভ্যাপসা গন্ধ।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিরাট বড় ড্রইংরুম এর মুখে যার শেষ প্রান্ত থেকে চওড়া সিঁড়ি গিয়ে দোতলায় মিলেছে। ইংরেজ স্থাপত্যের কারিগরি দেখলেই বোঝা যায়। উঁচু সিলিং থেকে বিরাট বড় ঝাড়বাতিটা তখনও ঝুলছিল ড্রইংরুমের মাঝখানে। দেওয়ালে বড় বড় দামি ছবি, মেঝেতে কার্পেট সবই আছে। কিন্তু সব ধুলোর পুরু আস্তরণে ঢাকা। একদিকে চামড়ার বড় সোফা সেট। কাঠের সেন্টার টেবিলটা ওলটানো, আর মেঝেতে ভাঙা কাচের টুকরো ইতি উতি ছড়ানো। ঘরের ভেতরে কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু সেই লোকটির বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ ছাড়া। তিনি একজনের হাত থেকে হ্যারিকেন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। দলটি তাঁর পিছন পিছন এগিয়ে এল।

ড্রইংরুমের বাঁদিকে একটা চওড়া করিডর। দলটি সেই করিডর ধরে সামনে এগিয় চলছে। ঠিক এমন সময় যে লোকটি সবার পেছনে পেছনে চলছিল আর সেই চটের থলের ওপর কিছু ছেটাচ্ছিল, সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আচ্ছা কেউ কি তার নাম ধরে ডাকলো? গ্রাম থেকে কেউ কি এসেছে তার পেছন পেছন? দলটি করিডরের শেষ মাথায় এসে বাঁ দিকের একটি দরজা খুলল। সাথে সাথেই একটা বিকট পচা গন্ধ ওদের নাকে ধাক্কা মারল। দরজাটার উল্টোদিকেই একটা কাঠের সিঁড়ি যেটা ঘরের অন্ধকার কুঠুরির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

দলটি সেই সিঁড়ি দিয়ে মাটির নীচের কুঠুরির ভেতরে নেমে এল। ভূমিকম্পে বাঁচতে বা অতিরিক্ত জিনিস রাখতে ইংরেজরা প্রায়শই এমন বেসমেন্ট বানাত। এখানে মেঝে উপরের মতো কাঠের নয়। শক্ত মাটির। কিন্তু একী! এই বেসমেন্টের মেঝেতে এসব কী? আঁতকে উঠল সকলে। মেঝেতে একটা বিশাল চিত্র আঁকা হয়েছে। সম্ভবত কালো বিড়ালের রক্ত দিয়ে। কারণ একটা পচা গলা কালো বিড়াল মেঝের একপাশে পড়েছিল। এছাড়াও ছিল আধপোড়া মোমবাতি, নানারকম শুকনো পাতা, ছাগলের কাটা মাথা, হরিণের শিং আর কতগুলো বাটিতে নানান রকম তরল। কী হয়েছে এখানে? লক্ষণ বলছে নিশ্চয়ই কোনও অশুভ উপাচার।

দলের প্রধান হ্যারিকেনের আলোয় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মেঝের ওপরে। মন্ত্রপাঠ থেমে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তিনি অবাক চোখে মেঝেতে আঁকা নক্সাটা দেখছেন। কি এটা? একটা বৃত্ত আর বৃত্তের চারদিকে চারটি বহির্মুখী অর্ধবৃত্ত। এটা কীসের চিহ্ন?

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাকিরা এখনও সেই বস্তায় ভরা জিনিসটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে সকলেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাঁর আদেশের অপেক্ষা করছিল। হ্যারিকেনের হলদেটে আলোয় কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাদের সকলের মুখ।

— "ওকে নামিয়ে রেখে এই মাঝখানটায় একটা গর্তও খোঁড়! চটপট।"

লোকটির নির্দেশে সাথে সাথে দলটি ঝটপট কাঁধ থেকে বস্তাটা এক পাশে

নামিয়ে রাখল। তারপর সকলে ঝপাঝপ কোদাল শাবল চালিয়ে একটা গর্ত খুঁড়তে লাগল।

— "চটপট! চটপট! আমাদের একে এখানে পুঁতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।" লোকটি নির্দেশ দিতেই দলের বাকি লোকেরা ঝটপট হাত চালাতে লাগল। ঝটপট মাটি কোপানো হয়ে যাচ্ছে। কিছুজন সেই গর্তের মাটি একদিকে চূড়ো করে সরিয়ে রাখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মোটামুটি গভীর গর্ত খোঁড়া হয়ে যেতেই লোকটি হাত উঁচিয়ে সকলকে থামতে নির্দেশ দিলেন। যেই লোকটি এতক্ষণ বস্তাটির ওপরে সেই তরল ছেটাচ্ছিল তাকে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলতেই লোকটি গর্তের মধ্যে তরলটি ছেটাতে লাগল। সেই সাথে চলল অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্রপাঠ। এই তরল গর্তটিকে মন্ত্রবদ্ধ করল। এরফলে কেউ চাইলেও এখান থেকে বেরতে পারবে না।

— "ওকে নিয়ে এসো। এনে গর্তের মধ্যে শুইয়ে দাও।" লোকটি মন্ত্রপাঠ থামিয়ে দলের লোকেদের নির্দেশ দিতেই কিছুজন সেই বস্তাটিকে ধরে আনতে গেল। কিন্তু সাথে সাথে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার বেসমেন্টের সেই কোণ থেকে ভেসে আসতেই চমকে উঠল দলের সকলে। হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল ঘরের এক কোণে বস্তার মুখ খোলা আর সেটা আলগোছে ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। আতঙ্কে শিউরে উঠল সকলে।

দলপ্রধান লোকটি গ্রামেই বলে দিয়েছিলেন এই বস্তার মুখ কোনভাবেই খোলা চলবে না। কোনভাবেই না। তাহলে! কী হবে এবার! যে লোকটি মন্ত্র পাঠ করছিল তাঁর মন্ত্রপাঠ আচমকাই থেমে গিয়েছে। গলাটা আতঙ্কে ভয়ে শুকনো হয়ে গিয়েছে। ঠিক এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এল বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে। কেউ যেন ওপর থেকে কিছু একটা গড়িয়ে দিয়েছে আর সেটা ধাপেধাপে পড়তে পড়তে একদম ওদের পায়ের কাছে এসে থমকে গেল।

ভয়ে ওদের সকলের বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল যেন হঠাৎ করেই। হ্যারিকেনের হলুদ আলোয় দেখা গেল একটা হাঁ হয়ে যাওয়া কাটা মুণ্ডু! যার নলি থেকে তখনো কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছিল। আরে এ তো সেই লোকটি, যে একটু আগে চটের বস্তার গায়ে জল ছেটাচ্ছিল। এই লোকটি যদি আগেই

মারা গিয়ে থাকে তাহলে এখুনি যে কবরে মন্ত্রবন্ধের জল ছেটাচ্ছিল সেটা কে? একটা অদ্ভুত শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়েছে সকলের মনের মধ্যে।

আর ভাবতে পারল না, কারণ ঠিক এমন সময় ওদের সকলের পেছনের অন্ধকারের মধ্যে কে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। ওরা সকলেই ভয়ে কেঁপে উঠল সে হাসি শুনে।

একটা বিকট পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘর জুড়ে। ভয়ে ভয়ে ওরা সকলেই একসাথে পেছন ঘুরল। আর তখনই হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় দৃশ্যটা ওদের চোখে পড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে নবীন শেরপার নাতি খাইসান। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, পুরো বাসি মড়ার মতো।

ঠিক এমন সময় একটা খচখচে শব্দ বেরিয়ে এল সেই গর্ত থেকে। একটা কালো শরীর বুকে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গর্তের ভেতর থেকে। সেই সাথে ছড়িয়ে পড়ছে দমবন্ধ করা বিকট চামড়া পোড়া গন্ধ। আর ঠিক তখনই সবকটা হ্যারিকেনের আলো একসাথে নিভে গিয়ে কুঠুরিটা পুরো অন্ধকারে ডুবে গেল এক আশ্চর্য মন্ত্রবলে।
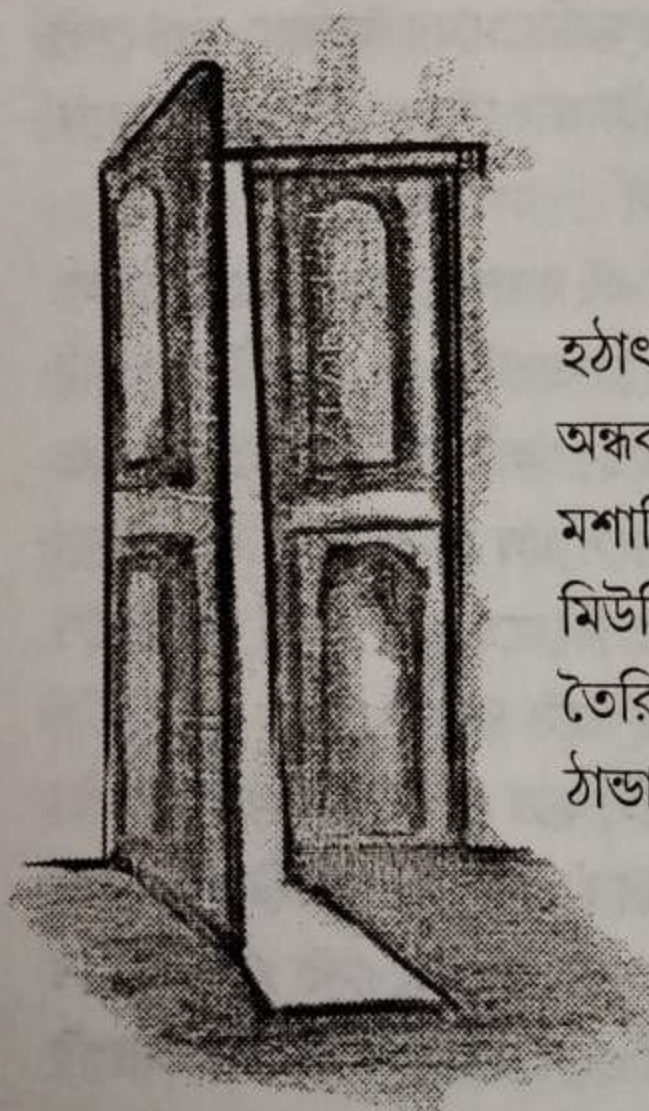
(২)

।। দৃশ্যসংযোগ ।।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল শিউলির। আবছা অন্ধকার ঘরেই চোখ মেলে তাকালো সে। মশারির দেওয়ালে, ছাদের জানলা গলে মিউনিসিপ্যালিটির আলো নানা রকমের নক্সা তৈরি করছে। কলকাতায় এখনও সেরকম ভাবে ঠান্ডা পড়েনি। কাছাকাছিই গঙ্গা হওয়ায় ছাদে উঠলে রাতের দিকে ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ব্যাস এইটুকুই। এর বেশি ঠান্ডা ডিসেম্বরের আগে কলকাতায় ঢোকে

না। শিউলি খুব সন্তর্পণে উঠে বসল বিছানায় তারপর ঘাড় ঘোরালো।

ঘরের ডানদিকের দেওয়ালের ওপরের দিকে ঝুলতে থাকা বড়ো দেওয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজার ইঙ্গিত। ওদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার চল। প্রায় দশটার মধ্যেই। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই শিউলির ঘুম আসছে না। একটা অদ্ভুত চাপা টেনশন যেন সবসময় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। উত্তর কলকাতার কাশীবোস লেনের এই পুরনো বনেদী বাড়িতে শিউলি আর তার পরিবার ছাড়াও থাকে পেয়িং গেস্ট বোরহান শেরপা।

বোরহানের বাড়ি সিকিমে। পড়ে শিউলির সঙ্গেই শিউলির ইউনিভারসিটিতেই। তবে অন্য সাবজেক্ট। বোরহানের সাথে শিউলির আরেকটা সম্পর্ক আছে। তারা একে অপরকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার টানেই সরকারী চাকরি থেকে সদ্য অবসর নেওয়া বাবাকে রাজি করিয়েছে বোরহানকে পেয়িংগেষ্ট হিসেবে রাখার জন্য। শিউলির বাড়িতে এই সম্পর্কের কথা কেউ জানে না। জানলে যে বোরহানের এই বাড়িতে ঠাঁই হবে না সেটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। শিউলির ইচ্ছে মাস্টার্সটা শেষ হলেই বোরহান যদি কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারে তাহলে বাড়িতে সে সম্পর্কের কথা জানাবে।

শিউলির এই কয়েকদিনের ভয় আর চাপা টেনশনটা তাদের সম্পর্ক নিয়ে নয়। বোরহান মেধাবী ছাত্র অল্পসময়েই চাকরি জোগাড় করে নেবে। কিন্তু কয়েকদিন ধরেই বোরহানের আচরণে এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে যে এটা ক্রমশ শিউলির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কয়েকদিন ধরে ও খাচ্ছে না ঠিক করে, কথা বলছে না কারো সাথে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে বসে আছে আর বিড়বিড় করে অদৃশ্য কার সাথে যেন কথা বলে চলছে।

কালকে দুপুরে শিউলির মা নাকি খাবার দিতে গিয়ে দেখে খাটের নীচে মাথা ঢুকিয়ে বসে কী এক অদ্ভুত সুরে বিড়বিড় করে নিজের মনেই বকে চলছে। এটা দেখে শিউলির মা এত ভয় পেয়েছে যে আজকের খাবার বাবা দিয়ে এসেছে।

বাড়িতে বোরহানের সাথে প্রকাশ্যে কথা বলা যায় না, যেটুকু হয় সেটাও ইউনিভারসিটিতে। কিন্তু বোরহানের এই টানা ইউনিভারসিটি না গিয়ে বাড়িতে

বসে এইসব অদ্ভুত আচরণ শুধু শিউলিকেই নয় তার বাড়ির লোকেদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। আজ রাতে শিউলির বাবা খাবার দিয়ে এসে বলেছেন বোরহানের নাকি ধুম জ্বর এসেছে। তার মধ্যেই খালি গায়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে কীসব ছবি আঁকছিল। শেষে শিউলির বাবা ধমকে ধামকে তাকে শুইয়ে এসেছেন। কিন্তু ফিরে এসে গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিয়েছেন এরকম চলতে থাকলে বেশিদিন বোরহানকে এই বাড়িতে রাখতে পারবেন না।

বসে বসে এসবই ভাবছিল শিউলি, এমন সময় কীসের একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ওপরের ঘর থেকে? কেউ যেন পা টেনে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওপরের ঘরে।

— আচ্ছা, ওই ঘরেই তো বোরহান থাকে!

শিউলি অবাক। কী ব্যাপার! বোরহান ঘুমোয়নি? কী করছে ও এত রাতে? একবার গিয়ে কি দেখে আসবে? যদি জ্বর বেড়ে থাকে? এসব ভাবতে ভাবতেই মশারি তুলে প্রায় আওয়াজ না করে বিছানা থেকে নেমে এল শিউলি। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘরের বাইরে এল। ঘরের বাইরে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার একপ্রান্তে টিমটিম করে জ্বলছে একটা হলুদ রঙের জিরো পাওয়ারের বাল্ব।

শিউলি বারান্দা বরাবর ডানদিকে এগিয়ে গেল। ওই দিকেই ওদের ঝাঁজরি লাগানো সরু সিঁড়ি। সে আওয়াজ না করে ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলাটাও একতলার মতোই। লম্বা বারান্দা। বারান্দার রেলিং হিসেবে সিমেন্টের নক্সাকাটা ঝাঁজরি ব্যবহার করা হয়েছে। বারান্দার একদিকে সারি দিয়ে পরপর চারটে ঘর। বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের উঠোন দেখা যায়। শেষ ঘরের মাথায় একটা হলুদ রঙের বাল্ব জ্বলছে। আর সেই বাল্বের মৃদু আলোই সারা বারান্দা জুড়ে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

খুব আসতে আসতে শেষের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল শিউলি। ওই ঘরটিই বোরহানের। দরজার বাইরে শিউলি এসে দাঁড়াতেই দেখল দরজাটি ভেজানো। ভেতর অন্ধকার কিন্তু একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। বাবা বলেছিল, বোরহান চোখের তারা নাকি বাসি

মড়ার মতো ঘোলাটে হয়ে উঠছে দিনদিন। খুব বাড়াবাড়ি কিছু বাধিয়ে বসেছে নির্ঘাত। শিউলি খুব আস্তে করে দরজা ঠেলে অন্ধকার ঘরের ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার ঘরে বারান্দার আলোরও কিছুটা ঢুকল। ঘরের একপাশে বিছানার লাগোয়া একটা খড়খড়ি লাগানো জানালা। সেটা এখন খোলা। রাস্তার আলো সেই খোলা জানালা বেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা আবছা আলো আঁধারির পরিবেশ তৈরি করেছে।

— কিন্তু একী! আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শিউলি, বোরহানের বিছানা খালি! অসুস্থ শরীরে কোথায় গেল সে?

আর ঠিক এমন সময় মাথার ওপর থেকে একটা শব্দ কানে আসতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠল তার। এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে বাঁদিকের বোর্ডের সুইচটা অন করতেই ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই সাদা আলোয় যা দেখল তাতে শিউলির সারা শরীর ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল যেন। অচিরেই একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে আর ছড়িয়ে পড়ল উত্তর কলকাতার এই বনেদী বাড়ির প্রতিটি কোণে। কিন্তু বেশিক্ষণ শিউলিকে এই দৃশ্য দেখতে হল না। কারণ ততক্ষণে পুরো বাড়ি ডুবে গিয়েছে লোডশেডিং এর কালো অন্ধকারে।

* * * * * * * * * * *

— "তুই বাইরেই দাঁড়া, দরকার পড়লে আমি তোকে ডাকব।" দোতালার বারান্দার শেষ প্রান্তে শিউলির সাথে দাঁড়িয়ে ছিল ওর ইউনিভারসিটির বন্ধু পলাশ।

একসঙ্গেই পড়ে। পলাশকে দেখতে গড়পড়তা বাঙালি ছেলের মতোই। বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই চেহারায়। পোশাক-আশাকও সাধারণ। আজ পরনে জিনস, হাফ হাতা টিশার্ট। কিন্তু যে জিনিসটা তাকে বাকি সকলের থেকে আলাদা করে তা হল ওর ঈষৎ পেশীবহুল শরীরের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা।

হ্যাঁ, শিউলি প্রথম যেদিন পলাশকে দেখেছিল সেদিন অবাকই হয়েছিল। এই

বয়সের কোনো ছেলে হাতে রুদ্রাক্ষের মালা পরে ঘোরে সেটা সত্যি আশ্চর্যের। পরে বুঝেছিল পলাশ দেখতে সাধারণ হলেও ও অন্যদের থেকে আলাদা। ও তন্ত্র মন্ত্র ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে। আর সে সব নিয়ে পড়াশোনাও করে।

শিউলির বাবা বোরহানকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিউলি যা দেখেছে সে নিশ্চিত এটা কোনো মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে পলাশকে ফোন করে। প্রথমে পলাশ তো মুখের ওপরেই না বলে দেয়, আর সাফ জানিয়ে দেয় যে সে কোনো পেশাদার অকালিস্ট নয়। সে শুধু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাঁটতে আর পড়াশোনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু শিউলির বিশ্বাস ছিল পারলে পলাশই পারবে বোরহানকে এই বিপদের থেকে রক্ষা করতে।

দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি, অনুযোগ-আবদারের পর পলাশ রাজি হয়। কিন্তু বোরহানের কিছু হয়ে গেলে তার দায় যে সে নেবে না সেটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিতে ভোলে না।

শিউলি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সিঁড়ির দিকে তাকালো। দোতলার মুখেই ওর বাবা, জ্যাঠা দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে বড়দের আপত্তি না মেনে পলাশকে ডাকা তাঁদের পছন্দ হয়নি।

শিউলি তাঁদের কান এড়িয়ে ফিসফিস করে পলাশকে বলে উঠল, "তুই প্লিজ বোরহানকে ঠিক করে দে। তুই জানিস ওর কিছু হয়ে গেলে আমি সত্যি বাঁচবো না।"

পলাশ বলে উঠল "তুই হয়তো গন্ধটা পাচ্ছিস না শিউলি। কিন্তু আমি পেয়েছি তোর বাড়ি ঢুকেই। একটা বিকট মাংস পচা গন্ধ। এটা ঠিক তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ পরপার থেকে এপারে আসে। তুই যা বর্ণনা দিয়েছিস আমায়, তা যদি সত্যি হয় তাহলে কাজটা আমার জন্য সোজা হবে না। কিন্তু কথা দিলাম, আমি চেষ্টা করব।"

* * * * * * * * * *

ঘরটা খুব একটা বড় নয়। ঘরের ভেতরে পাখা চলছে না। একটা ভ্যাপসা

গরম। কলকাতায় কার্তিকের মাঝামাঝিতেও পাখা চালাতে হয়। কিন্তু ও কী?

হলুদ আলোয় এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই তার নজরে এল, ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে কেউ একই নক্সা বারবার এঁকে রেখেছে মোম রঙ দিয়ে। একটি বৃত্ত, আর বৃত্তের পরিধির ওপরে চারদিকে চারটি অর্ধবৃত্ত। এই নক্সা এর আগেও কোথাও দেখেছে পলাশ, কিন্তু মনে করতে পারছে না কিছুতেই যে কোথায় দেখেছে। আর ঠিক এমন সময়ই দ্বিতীয় জিনিসটা তার নজরে এল। চমকে উঠল পলাশ।

ঘরের যে দেওয়ালে জানালা নেই সেখানে টিকটিকির মতো উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে একটা অর্ধনগ্ন পুরুষ দেহ। সেই দেহের মাথা নীচের দিকে আর পা দুটো জড়ো হয়ে ছাদের দিকে। হাত দুটো দেহের দুইপাশে এমনভাবে ছড়ানো— হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোনো উল্টানো ক্রস দেওয়ালে আটকানো। চোখে তারার বালাই নেই। পুরোটা সাদা।

বোরহানকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় দেখে একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে পড়ল পলাশের সারা শরীরে। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতেই বোরহান মাথা ঘোরাল। পলাশের চোখে তাঁর চোখ পড়তেই বোরহান পলকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। একপা পিছিয়ে গেল পলাশ। ছেলেটি উঠে দাঁড়াতেই ঘরের ভেতরের আলোটা দপদপ করে উঠল। সেই কম্পমান আলোয় পলাশ দেখতে পেল ছেলেটা বাঁদিকে ঘাড় হেলিয়ে তার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে।

নাহ! আর দেরি করা চলবে না। পলাশ বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ শুরু করল। আর তারপরেই যেই জিনিসটা হল তার জন্য ছেলেটি তৈরি ছিল না একদম। সে দেখল পলাশের রুদ্রাক্ষের মালার ফাঁক থেকে অদ্ভুত এক সবুজ আলো বেরিয়ে আসছে। আর পলাশ মন্ত্রপাঠের সাথে সাথে রুদ্রাক্ষের মালার এক একটা প্যাঁচ খুলতে শুরু করেছে।

চমকে উঠল বোরহান। ঘোলাটে চোখ বড় বড় করে বোঝার চেষ্টা করল এই ছেলেটা কে। কে এই ছেলেটা? এদিকে ততক্ষণে পলাশের মন্ত্রপাঠের গতি বাড়তে শুরু করেছে। গতি বাড়তে শুরু করেছে বাম হাতেরও। অতিদ্রুত

খুলে যাচ্ছে রুদ্রাক্ষের মালার প্যাঁচ। ঘরের আলো ভয়ঙ্কর ভাবে দপ্ দপ্ করতে শুরু করেছে। একটা গরম হাওয়ার স্রোত বইছে যেন ঘরের মধ্যে। আর ঠিক তখনই পলাশের হাতের মালাটা খুলে গেল পুরো।

একটা ভয়ের আর্তনাদ বেরিয়ে এল ছেলেটার গলা দিয়ে। এ কী দেখছে সে?

পলাশের ডান হাতের কব্জিতে একটা নাগ উল্কি। যেটা রুদ্রাক্ষের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছিল। সেটা নড়ছে! হ্যাঁ নড়ছে। এবার বোরহান এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে। এ কে? এ কে এসেছে এই ঘরে? বোরহান একটা লাফ দিয়ে খড়খড়ি দেওয়া জানালা গলিয়ে পালাতে যাবে তার আগেই রুদ্রাক্ষের মালা তার গলায় পেঁচিয়ে পলাশ পেছন থেকে হ্যাঁচকা টান দিল। ছেলেটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে যেতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে তার পেটের ওপর চেপে বসল পলাশ। মন্ত্রপাঠের শব্দ ঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ছে। বোরহান মরণ আর্তনাদ করে হাত পা ছুঁড়তে লাগল ভয়ঙ্করভাবে। আর এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল পলাশ। এক মুহূর্ত দেরি না করে রুদ্রাক্ষের মালাটা তার হাঁ করা মুখের ভেতরে ঠুসে দিতেই একটা সাদা আলোর বিস্ফোরণ।

আর তখনই একটা আবছা দৃশ্য সিনেমার মতো ফুটে উঠল পলাশের চোখের সামনে। একটা মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে কতগুলো অস্পষ্ট হ্যারিকেনের হলুদ আলো জ্বলছে। আর সেই হলুদ আলোয় দেখা গেল বোরহানের মতো দেখতে একটা ছেলে পরপর কতগুলো মৃতদেহ টেনে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ফেলছে। পলাশের মনে হল সে যেন ওই মাটির নীচের ঘরে অলৌকিক ক্ষমতায় পৌঁছে গিয়েছে।

ছেলেটা এখানে কী করছে জিজ্ঞেস করলে হয় না? ওই তো... ছেলেটি বোধহয় তাকে দেখতে পেয়েছে। নইলে সে এগিয়ে আসছে কেন পলাশের দিকে? কিন্তু ওটা কী? একটা জিনিস দেখে ভয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল পলাশ। গর্তের মাটি যেখানে চুড়ো করে জমা রাখা আছে, তার ওপরে ওটা কে? একটা কালো শরীর উবু হয়ে বসে আছে। বীভৎস মুখের চামড়া কে যেন পুড়িয়ে ফেলেছে যত্ন করে। সারা শরীরে শুধু চামড়া পোড়া ক্ষত। আর পিঠের আধপোড়া ডানাটা তিরতির করে কাঁপছে। লাকুন! নরকের ভয়ঙ্কর অপদেবতা!

সর্বনাশ! এখানে কী করছে লাকুন! কে ডেকে এনেছে একে?

ছেলেটিকে সাবধান করতে হবে। ওকে বলতে হবে ও যেন পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায়! নইলে ও যে মারা পড়বে। কিন্তু কিছু বলবার আগেই আচমকা কী যে হল, পলাশ দেখল একজোড়া শক্ত হাত তার গলা টিপে ধরেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ডানহাতটা দেখা যাচ্ছে। একী? এই হাতে তো তার মতোই রুদ্রাক্ষের মালা প্যাঁচানো। হাতটা সাঁড়াশির মতো শক্ত হয়ে চেপে বসছে তার গলায়। দম নিতে পারছে না সে। দেখতে দেখতে পলাশ চোখের সামনে অন্ধকার দেখল। মাথাটা আচমকাই পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল তার। এক মুহূর্ত সময় গেল না, তার মনে হল সে যেন ওই মাটির নীচের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ল।

(৩)

।। প্রেত আবাহন।।

রাত্রি বোধকরি দশটা।

একটা অন্ধকার লম্বা হলঘর। ঘরের মাঝে কতগুলি কাঠের খুঁটি। দেখলেই বোঝা যায় লম্বা ঘরের উঁচু ছাদ ধরে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে আলো প্রায় নেই বললেই চলে। টিমটিম করে একখানা সরু মোমবাতি ঘরের শেষ মাথায় জ্বলছে প্রায় না জ্বলার মতোই। মোমবাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে ঘরের দেয়াল-ছাদ সব কাঠের তৈরি। আর এসব জুড়ে কালো কালো ছোপ। ঠিক যেন পুড়ে যাওয়ার নিদর্শন। এই ঘরটি নির্ঘাৎ কোনো ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যেই লোহার ঠুং ঠাং শব্দ পাওয়া গেল। অচিরেই মোমবাতির মৃদু আলোয় দেখা গেল একটি ছায়াশরীর অন্ধকারের মধ্যেই নড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এতক্ষণ যেন অন্ধকার গায়ে মেখেই কাঠের মেঝের এককোণে শুয়েছিল। ছায়া শরীর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। একটা লম্বা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা। আন্দাজে বোঝা যায় সরু, রুগ্ন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া

চুল। আধা অন্ধকারে লিঙ্গ পরিচয় বোঝার উপায় নেই। দুপায়ে শিকলের বেড়ি একটি কাঠের খুঁটির সাথে বাঁধা।

এই অন্ধকার ঘরে কে বন্দী করে রেখেছে একে? আর কেন রেখেছে? মোমবাতির আলোয় দেখা গেল ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ছেটানো অনেকগুলো জিনিস। ছায়াশরীরটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জিনিসগুলোর দিকে। পায়ে লাগানো শিকলের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এল টুংটাং শব্দ। ধীরে ধীরে জিনিসগুলোর কাছে বসে দড়ি খুলে কাঠের বাণ্ডিল থেকে বের করে আনলো পাঁচখানা কাঠের ক্রুশ। কালো রঙে ভেজা ব্রাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রুশগুলো রঙ করে সেগুলোকে ধীরে ধীরে আলপিন আর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে দিয়ে সরে এল আগের জায়গায়।

ঠিক এই সময়ই মোমবাতির আলোয় দেখা গেল সেই দেওয়াল জুড়ে একাধিক ছোট ছোট কালো রঙের ক্রুশ দেওয়ালটিতে আটকানো। কিন্তু ছায়াশরীরের এই মুহূর্তে আটকানো ক্রুশগুলো বাকি ক্রুশগুলোর থেকে ভারী বিসদৃশ দেখতে লাগছিল। কারণ, বাকি ক্রুশগুলোর মাথা নীচের দিকে ছিল। যা এক ভয়ঙ্কর অশুভ ইঙ্গিত।

কাজটা শেষ হতেই ছায়াশরীর পরনের ঢিলেঢালা পোশাকটা শরীর থেকে খুলে একপাশে ছুঁড়ে দিতেই বোঝা গেল এ এক নারী শরীর। কিন্তু একী! সারা শরীরে এই দগদগে আঘাতের চিহ্ন কেন? মেয়েটি একটা কাঁটাওলা চাবুক তুলে নিলো। আর এক মুহূর্তে দেরি না করে সেই চাবুক বাতাস কেটে সপাং করে পিঠে আছড়ে পড়তেই মেয়েটা কঁকিয়ে উঠল। মেয়েটা নিজেই নিজেকে আঘাত করছে? কিন্তু কেন?

সাথে সাথে আবার সপাং করে চাবুকটা আছড়ে পড়ল মেয়েটির পাতলা চামড়ায়। চামড়া ফেটে ধীরে ধীরে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মেয়েটির চাবুক থামল না। কঁকিয়ে, চিৎকার করে উঠছে মেয়েটি যন্ত্রণায় কিন্তু কোন এক অদৃশ্য তাড়নায় চাবুক মারা থামাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই বীভৎস নারকীয় প্রক্রিয়া চলার পরে যখন মেয়েটির ফেটে যাওয়া চামড়া থেকে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছিল, মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছে

মেয়েটির শরীর পারছে না এই যন্ত্রণা নিতে। কিন্তু তবুও উঠে দাঁড়ালো। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে একটা মাটির সরা তুলে চুঁইয়ে পড়া রক্তগুলো ধরতে লাগল সেই পাত্রে। বেশ কিছুটা রক্ত সেই মাটির পাত্রে জমা হতেই মেয়েটি সরাখানা মাথার ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল চাপাস্বরে, "খাবি আয়...। খাবিইইই আয়য়য়...। খাবি আয়য়য়য়য়...।"

একটা বিকট পচা গন্ধ আর সেই সাথে একটা কাঠে কাঠ ঘসার শব্দ হচ্ছে। ওই যে, ওই যে মেয়েটির আটকানো ক্রুশগুলো উলটে যাচ্ছে আপনা থেকেই। মোমবাতির ক্ষীণ আলো কেঁপে উঠল হঠাৎ করেই। সেই আলোয় দেখা গেল আচমকাই ঘরের মধ্যে হাজির হয়েছে একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধীরে ধীরে সেই কুণ্ডলী বদলে যাচ্ছে একটা লম্বা ছায়ায়। সেই লম্বা ছায়া সেই ক্ষতবিক্ষত মহিলার দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল, —"খাবার রেখে দে। আগে তুই বল, ওই ছেলেটা কী করে জড়াল এসবে? কোথায় ছিল ও?"

মেয়েটি ভয় পেয়ে কোন রকমে বলে উঠল, "কে? কার কথা বলছেন?"

— "নরকদ্বার রক্ষী।"

— "কীই!" মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠল যেন।

— "হ্যাঁ, ও দেখতে পেয়ে গিয়েছে লাকুনদের একজনকে।"

— "এবার কী হবে?"

ছায়াশরীরটি হিশহিশে স্বরে বলে উঠল, "বাকিদের ডেকে পাঠা। ওরা বেরিয়ে আসুক। ছেলেটাকে এখুনি আটকাতে হবে। নইলে আমাদের পরিকল্পনা কখনওই সফল হবে না। তবে খবরদার আমার নাম নিবি না।" কথাটা বলেই ছায়াশরীরটি লম্বা হাত বাড়িয়ে মাটির সরাটা ছাড়িয়ে নিলো। এই ভোগ ছাড়া চলবে না তার। এ ভোগ তার খুব প্রিয়।

* * * * * * * * * * *

সদ্য চোখটা লেগে এসেছিল। ঠিক তখনই একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ নীচ থেকে ভেসে এল। ঘুম ভেঙে উঠে বসল রণ। দেখল কখন পড়তে পড়তে টেবিলের

ওপরে রাখা খোলা বইয়ের ওপরেই মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিল। টেবিল ল্যাম্পের আলোর তলায় জ্বলতে থাকা রেডিয়াম কাঁটার টেবিল ক্লকটা টিক টিক করে দুটো পনেরো বাজবার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

— "কী অবস্থা!" নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল রণ। কতক্ষণ এভাবে ঘুমিয়ে আছে সে?

টেবিলের ওপরে বইটা সদ্য বন্ধ করে চশমাটা খুলে রেখেছে, ঠিক তখনই নীচের সদর দরজায় আবার একটা জোরে শব্দ হল। "ঠক ঠক ঠক।"

এত রাত্রে কে এল? ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল তার। ঠিক এমন সময় নীচে ধীরুকাকার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "কে? কে বাইরে?"

কোনও সাড়া নেই। তার বদলে এল আবার সেই কেঠো ঠকঠক আওয়াজ।

— "কী হল? কে আছো? বলো, নইলে দরজা খুলব না।"

রণ নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পুরনো দিনের বনেদী বাড়ি। বড় বড় ঘর। উঁচু উঁচু ছাদ। খড়খড়ি দেওয়া বড় বড় জানালা। এছাড়াও দামি-দামি আসবাব সারা বাড়ি জুড়ে। কিন্তু এতবড় বাড়ির সদস্য সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র দু'জন। একজন রণজয়, আর দ্বিতীয় জন ধীরেন ঘোষ। রণজয়ের ধীরুকাকা। ধীরুকাকার সাথে রণজয়ের কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। রণর জন্মের আগে থেকেই ধীরেন এই বাড়িতে থাকে। রণজয় কখনওই তাকে এবাড়ির কাজের লোক বলে মনে করেনি। সমস্ত কিছু একলা হাতে এই ধীরেন ঘোষ সামলাচ্ছে এতদিন ধরে। সৎ লোকটার কোনোদিন একপয়সার লোভ নেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন এই বাড়ির মালিক নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তখন অন্য কেউ হলে টাকাপয়সা, জিনিসপত্র সরিয়ে সহজেই বড়লোক হয়ে যেত। রণজয়ের তখন টালমাটাল অবস্থা। এই ধীরেন বুকে করে সব যক্ষের মতো আগলেছে। রণজয়কে, এই সম্পত্তিকে, এই বাড়িকে।

আজ রণজয় অনেকটা পরিণত, সবকিছু সামলে পড়াশোনায় নিজেকে কৃতি বানিয়েছে নিজের গুণে। কিন্তু ধীরেনের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আজও হাঁটুর ওপরে ধুতি, কাঁধে সব সময় গামছা, আগে খালি পায়ে হাঁটত, রণ অনেক বলার পর হাওয়াই চটি পরা শুরু করেছে। কিন্তু কিছু জিনিস রণ

কিছুতেই বলে বলে পরিবর্তন করাতে পারেনি। যেমন রান্না ঘরের মেঝেতে কম্বল পেতে শোয়া। কতবার রণ বলেছে ওপরে নীচে এতগুলো ঘরে খাট পাতা আছে তাতে গিয়ে শুতে, কিন্তু ধীরুকাকা কিছুতেই রাজি হয়নি। কিছু বলতে গেলেই বলে নরম বিছানায় শুলে ঘুম ধরবে না।

রণ সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে নীচের বড় বৈঠকখানা পরিষ্কার দেখা যায়। রণ ওপর থেকে দেখল নীচের তলার প্রায় সবকটা আলো জ্বালিয়ে বন্ধ দরজার এপারে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরুকাকা।

ফের ঠক ঠক ঠক। ধীরুকাকা কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই রণজয় ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "দাঁড়াও! আমি আসছি।" রণ দেরি না করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

ধীরুকাকা গজগজ করছে এই অসময়ের আগন্তুকের জন্য। রণ মুচকি হেসে দরজাটা খুলল। আর সাথে সাথে বদলে গেল রণজয়ের মুখের ভঙ্গী।

— "পলাশ!" প্রায় আঁতকে উঠল রণজয়।

হ্যাঁ দরজার উলটোদিকে পলাশ ছিল। কিন্তু একী অবস্থা হয়েছে তার? মাথার চুল উসকো খুসকো। পরনের পোশাকে ধুলো। চোখের তলায় কালি। কিন্তু চোখ জোড়ায় কী ভয়ঙ্কর অস্থিরতা।

ধীরেনও চমকে উঠেছে এত রাত্রে পলাশকে দেখে। "একী দাদাবাবু ! একী অবস্থা হয়েছে তোমার। এসো এসো ভেতরে এসো।"

পলাশের পা টলছিল। "আয় আয়। ভেতরে আয়। বস।" পলাশ ঘরের ভেতরে ঢুকতেই রণ চটপট দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো।

— "বসবার সময় নেই রণ। আমার তোর সাথে কিছু জরুরি কথা আছে।" পলাশের গলার স্বরে উদ্বেগ দেখে রণর ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল।

— "সব কথা শুনবো। তুই আগে জল খা।" ধীরুকাকা রণজয়ের ইশারা বুঝল। সাথে সাথে রান্নাঘরের দিকে ছুটল জল আনতে।

রণজয় ফিসফিস করে বলে উঠল, "তুই বল তুই কোথায় ছিলি। কাল থেকে তোর কোনও খবর নেই। তোর বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখলাম দরজায় তালা লাগানো। নীচের ভাড়াটিয়া কাকিমা বলল তুই নাকি কাল রাতেই কোথাও

বেরিয়েছিলি। তারপর নাকি আর ফিরিসনি। কোথায় গেছিলি? একটা ফোন করবি তো? টেনশন হয় না?"

পলাশের ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, সে রান্না ঘরের দরজার দিকে তাকাল, রান্না ঘর থেকে ঠুং ঠ্যাং শব্দ ভেসে আসছে। "আমি একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছি রণ। যেটা দেখা আমার উচিত ছিল না। আর আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আসতে চলেছে রণ। একটা ভয়ঙ্কর বিপদ!"

— "কী বলছিস এসব? বিপদ আসতে চলেছে?" রণজয়ের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। এসব কী বলছে পলাশ? রণজয় বুঝতে পারল তার ডানহাতের উল্কিটা জ্বলতে শুরু করেছে আচমকা। এটা হয়। আগাম কোনও বিপদের সঙ্কেত আসলেই পুরো উল্কিটা জুড়ে একটা জ্বালা শুরু হয়। অনেকদিন এটা হয়নি। আজ দীর্ঘদিন পরে আবার এই জ্বালাটা নতুন করে শুরু হচ্ছে তাঁর। "তুই কী দেখেছিস পলাশ?"

রান্না ঘরের দরজায় ধীরু কাকার ছায়া পড়ছে। পলাশ রণজয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, "লাকুন!"

— "কী?" রণজয়ের অবাক হয়ে যাওয়া মুখে এছাড়া আর কোনও শব্দ যোগাল না।

* * * * * * * * * * *

— "তুই আবার এইসব জিনিসের মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছিস?" নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করেই চিৎকার করে উঠল রণজয়। পলাশ দেখল রণজয়ের ফর্সা টিকালো নাকটা ধীরে ধীরে রাগে লাল হয়ে উঠছে।

— "তুই জানতে চাইছিলি না কাল থেকে আমি কোথায় গিয়েছিলাম, আমি কাল থেকে ছেলেটির সঙ্গেই ছিলাম। শিউলি ডাকাতে আমি গিয়ে ছিলাম বটে কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ওর কোনও সাহায্য করতে পারিনি। ছেলেটি পোজেসসড হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যভাবে ওর মধ্যে কোন এভিল স্পিরিট ছিল না। ভাবতে পারছিস? আমি বুঝতে পারছিলাম আমি কিছুই করতে পারবো না। তাই আমি ওদেরকে বলি ছেলেটিকে হসপিটালে নিয়ে যেতে। কিন্তু

বিশ্বাস কর আমি ছেলেটিকে একলা ছাড়তে পারিনি। এই একটু আগেও যা দেখে এসেছি ছেলেটির শরীর ওই শয়তানকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। লাকুন...”

পলাশের কথা থামিয়ে রণজয় বলে উঠল, “তুই শিওর কীভাবে হচ্ছিস যে ওটা লাকুন?”

— “রণ তুই বুঝতে পারছিস না। আমি যখন প্রায় ছেলেটিকে আয়ত্তে এনে ফেলেছিলাম ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। যেই ঘরে ছিলাম দৃশ্যটা সেই ঘরের ছিল না। অন্য একটা জায়গার ছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি... ওটা লাকুনই ছিল।” পলাশ শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

— “তুই কী ওই ঘরে কোনকিছু পোড়া গন্ধ পেয়েছিলি? যেমন মাংস পোড়া বা চামড়া পোড়া?...লাকুনের উপস্থিতি যেই গন্ধে বোঝা যায়?”

— “না। কিন্তু আমি একটা পচা গন্ধ পাচ্ছিলাম।”

রণজয় চিৎকার করে উঠল, “এদিকে বলছিস ছেলেটির মধ্যে কোনো এভিল স্পিরিট ছিল না আবার বলছিস সেখানে লাকুন ছিল। তুই ভালো করেই জানিস লাকুন মানুষের দেহ ধারণ না করতে পারলে বেশিক্ষণ নিজের শরীরে এই জগতে থাকতে পারে না।”

— “হ্যাঁ, আমি সেটা জানি। কিন্তু...”

— “কোনও কিন্তু নয়। তোকে মনে করিয়ে দিই নরকের জীব যদি সত্যি এদিকে আসে তাহলে একটা কথা মাথায় রাখবি, ওদেরকে এদিকে আনা হয়েছে। কেউ এই জগত থেকেই ওদেরকে ডেকে এনেছে। সেখানে তুই আমি কী করতে পারি? যে কাজের জন্য ডাকা হয়েছে সেই কাজ করে ওরা ফিরে যাবে।” রণজয় কথা বলতে বলতে পড়ার টেবিলের বইগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল।

— “আর ব্যাপারটা যদি এত সোজা না হয়?” পলাশ বিড়বিড় করে বলে উঠতেই রণজয় অবাক হয়ে বলে উঠল, — “মানে?”

— “তুই ভালো করেই জানিস, নরক জীবেদের এই জগতে আসাটা যে

ডাকছে তার ইচ্ছেয় হলেও ফিরে যাওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ ওদের ইচ্ছেতে। আর তুই এটাও জানিস ওদের এই জগতের প্রতি আসক্তিটা কতটা ভয়ঙ্কর।"

রণজয় হাতের বইগুলো বিছানার ওপরে ছুঁড়ে বলল, "তুই কথাটা অন্যদিকে চালিত করছিস, খ্রিস্টীয় পুরাণ মতে তুই যদি নরকের কনসেপ্ট মানিস তাহলে নরকে আটজন অপদেবতা আছে যারা নরক শাসন করেন। পাইমন, বেলেথ, পুরসন, অ্যাস্মোডাই, ভাঈন, বালাম, জাগান আর বেলিয়াল। এরা প্রত্যেকেই শক্তিশালী আর এদের প্রত্যেকের অন্তর্গত নানান সংখ্যার অশুভ নরকজীব আছে। আর তুই এখানে দাঁড়িয়ে যার কথা গলাবাজি করে বলছিস সেই লাকুন নরকের সব থেকে ভয়ঙ্কর, ধূর্ত অপদেবতা বালামের অন্তর্গত। তাই তোকে অনুরোধ করবো, এসব থেকে দূরে থাক। সামনেই ইউনিভারসিটির পরীক্ষা, সেটায় মন দে।"

— "রণ, প্লিজ! তুই ব্যাপারটা এইভাবে ইগ্নোর করছিস? খুব ভয়ঙ্কর বিপদ আসতে চলেছে তুই বুঝতে পারছিস না?"

— "তুই আমার থেকে কী চাইছিস পলাশ? স্পষ্ট করে বল তো।" রণর কপালের ভাঁজ আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

— "আমি চাই তুই আমাকে সাহায্য কর। আমি একলা লড়তে পারবো না রণ। যে রুদ্রাক্ষের মালাটা তুই খুলে ঠাকুরের সিংহাসনের তুলে রেখেছিস সেটা আবার ধারণ কর। নাহলে হাতের যেই জ্বালাটা এতক্ষণ তুই মুখ বুজে সহ্য করছিস সেটা কিছুতেই থামবে না।" পলাশ চোখে আকুতি নিয়ে রণজয়ের দিকে তাকাল কিন্তু শেষের কথাগুলো শুনতে শুনতে রণজয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ঠিক এমন সময় নীচের বৈঠকখানার ল্যান্ডফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

— "যেই জিনিস আমি খুলে রেখেছি সেটা আমি ধারণ করব না পলাশ। তুই সেই আশাও করিস না। আমি নিজেকে এসব থেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার একমাত্র লক্ষ্য একাডেমিক দিক থেকে নিজেকে স্ট্রং করা। আর আমি চাই তুইও এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নে।"

এমন সময় ধীরুকাকার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল নীচ থেকে, "পলাশ

দাদাবাবু, তোমার ফোন।” পলাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাকাল রণজয়ের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রণজয় যখন নীচে এল দেখল পলাশ কালো রঙের ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখছে, — “কার ফোন?”

রণজয়ের প্রশ্নে পলাশ বিড়বিড় করে বলে উঠল, “আসার সময় শিউলিকে তোর বাড়ির নাম্বারটা দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম দরকারে ফোন করতে। ও জানাল বোরহান মারা গিয়েছে একটু আগেই।” কথাটা বলেই পলাশ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রণ অবাক হয়ে বলল, “তুই এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস? আজ এখানেই থেকে যা।”

রণজয়ের কথা শুনে পলাশ মুচকি হাসল, “আমরা অনেক কিছুই আশা করি রণ। সব কি আর সেইমতো হয়? আমরা চাই আমাদের লড়াইয়ে কেউ আমাদের সাহায্য করুক। কিন্তু জানিস, প্রত্যেকের লড়াই প্রত্যেককে একলাই লড়তে হয় কোনও না কোনওভাবে।” কথাটা বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল পলাশ।

রণ দরজার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে যেন সে। কী করবে এখন সে?

— “একী? এটা কী হল গো?” ধীরুকাকার ডাকে চমক ভাঙল রণর। সে দেখল ধীরুকাকা একটু আগে পলাশের খাওয়া কাচের জলের গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। জিনিসটা দেখে তার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা আতঙ্কের শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল। সে দেখল পলাশ যেই গ্লাসে জল খেয়েছিল তাঁর জল পুরো কালো হয়ে গিয়েছে। ঠিক আলকাতরার মতো কালো। রণ চমকে পলাশের যাওয়ার পথের দিকে তাকাল। আচ্ছা! সেকি হঠাৎ করে একটা চামড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছে? নাকি এসব তার মনের ভুল? আর ঠিক তখনই আচমকা রণর হাতের উল্কির জ্বালাটা বেড়ে গেল।

* * * * * * * * * *

রাস্তাটা অন্ধকার নয়। কিন্তু নির্জন।

অন্যদিন রাস্তায় দু-তিনটে কুকুর কুন্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। আজ তারাও

নেই। কর্পোরেশনের আলো সারা রাস্তায় একটা হলুদ মায়াবী পরিবেশ তৈরি করছে। পলাশ ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। অনেক আশা নিয়ে রণজয়ের কাছে গিয়েছিল। সে ভাবতেও পারেনি রণ আজকেও তাকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু পলাশের যে তাকে এই সময় ভীষণ দরকার ছিল। সে কি একলা পারবে?

হঠাৎ চলতে চলতে রাস্তার মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পলাশ। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা তারই পাড়া। আর চল্লিশ পায়ের মতো হাঁটলেই তার বাড়ির লোহার গেট। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার সবকটা আলো একসাথে দপদপ করে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে উঠল পলাশের। রাস্তার মাঝ বরাবর একটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। মুখটা আলোছায়ায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ এটা কীসের গন্ধ যেটা তার নাকে ধাক্কা মারছে? একটা বিশ্রী চামড়া পোড়া গন্ধ না? একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে। তাহলে কি...?

ঠিক তখনই পেছনদিকে একটা পা টানার শব্দ হতেই চমকে পলাশ পেছন ঘুরল। আর যা দেখল তাতে অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল তার। একদল লোক ঠিক তার পেছনেই রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে।

নারী, পুরুষ, বুড়ো, বুড়ি নির্বিশেষে সেই দলে জনা পনেরোর মতো লোক। যাদের প্রত্যেকেরই মুখের চামড়া বিকটভাবে পোড়া। শুধু মুখ কেন ছেঁড়া কাপড়ের আড়ালে পুরো শরীরটাই যেন তাদের ঝলসে যাওয়া। তাদের চোখের দৃষ্টি বাসি মরার মতো ঘোলাটে। দাঁতের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়া নাল বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাদের খিদে পেয়েছে। আর খাবার তাদের সামনে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পলাশকে জানান দিলো একটা ভয়ঙ্কর কিছু হতে চলেছে। পলাশ আর দেরি না করে সাথে সাথে পরনের টি শার্টটা খুলে ফড়ফড় ছিঁড়ে নিলো দু টুকরো করে। তারপর যতদ্রুত সম্ভব দুই হাতের তালুতে ভালো করে পেঁচিয়ে নিল টিশার্টের ছেঁড়া টুকরোগুলো।

ওদিকে পুরো দলটা ধীরে ধীরে পা টেনে পলাশের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। পলাশ চোখ বন্ধ করে গুরুর দেওয়া গুরুমন্ত্র একবার স্মরণ

করেই জিন্সের ডান পকেটে হাত দিলো। মনে মনে আশ্বস্ত হল সে। হ্যাঁ জিনিসটা আছে।

ঠিক এমন সময় একটা ঠান্ডা হওয়া বয়ে যেতেই কেঁপে উঠল পলাশের পেশীবহুল শরীরটা। কোথাও গিয়ে পলাশ যেন জানে কী হতে চলেছে। আর হলও তাই। ঝুপ করে হঠাৎ লোডশেডিং। আর এক লহমায় উজ্জ্বল রাস্তাটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল।

এক মুহূর্ত দেরি না করে পলাশ সাথে সাথে জিন্সের পকেট থেকে লাইটারটা বের করে টিশার্টে আগুনটা ধরাতেই দাউদাউ করে হলুদ আগুনে জ্বলে উঠল হাতে বাঁধা টি শার্টের টুকরোটা। কিন্তু এখন তো থামলে হবে না। লাইটারটা সাথে সাথে পকেটে চালান করে দু'হাতে একটা জোরে তালি দিয়েই বিড়বিড় করে পাঠ করে উঠল গুরুমন্ত্র।

আর তারপরের লহমায় যা হল তা সত্যি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। পলাশ তার দুই হাত দেহের দুইদিকে বিস্তৃত করতেই সাথে সাথে হাতের হলুদ আগুন পালটে গেল সবুজ আভায়। এ আভা নরকের আভা। এই আগুন নরকের আগুন। এই আগুন পোড়ায় না। জ্বালায়। এই আগুন একমাত্র ধারণ করতে পারে পলাশ। আর কেউ না।

আর তখনই সবুজ আগুনের আভায় দেখা গেল পলাশকে ঘিরে ধরেছে একপাল ভয়ঙ্কর দর্শন জীব। তার দুই হাতে জ্বলতে থাকা সবুজ আগুন একটা অগ্নিবলয় তৈরি করছে তাকে ঘিরে। একটা চাপা আক্রোশের হিংস্র গর্জন বেরিয়ে আসতে লাগে তাদের লোভী নরখাদক মুখের ভেতর থেকে। কিছুজন ওদের মধ্যে থেকেই চেষ্টা করতে লাগল সেই আগুনের বলয় পার করে পলাশের কাছে পৌছানোর কিন্তু ওরা এগোতে পারছে না। সবুজ আগুনের অভেদ্য বলয় পার হওয়া তাদের সাধ্য নয়। যাদের শরীর সেই আগুনের বলয় ছুঁলো তারা মুহূর্তেই পুড়ে ছাই হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু কতক্ষণ! কতক্ষণ এদের এভাবে আটকাতে পারবে পলাশ? রুদ্রাক্ষের মালার ভেতরে লুকিয়ে থাকা পলাশের কব্জির নাগ উল্কি ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে শুরু করেছে। এ যে ভয়ঙ্কর বিপদের সঙ্কেত!

নরকজীবের দল তাকে ঘিরে ধরেছে চতুর্দিক থেকে। তাদের হিংস্র শ্বদন্ত বারবার জানান দিচ্ছে একবার পলাশকে তারা বাগে পেলেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করে খেয়ে ফেলবে তাকে।

ওদিকে পুড়তে পুড়তে হাতের কাপড় ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আগুন তো নিভে যাবে। পলাশ মনে মনে প্রমাদ গুনল। হাতের কাপড়ে জ্বলতে থাকা সবুজ আগুনের শিখা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করতেই তাকে ঘিরে তৈরি করা বৃত্ত ছোট করতে লাগল। ওদের চোখ মুখ চক্ চক্ করে উঠল এক আদিম উল্লাসে।

ঠিক তখনই আগুনের বলয় ভেদ করে বাম হাতের কব্জিতে একজন নরকজীব চেপে ধরতেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল পলাশ। উফ! কী বীভৎসভাবে জ্বলে উঠল হাতের সেই জায়গাটা।

সেই মুহূর্তে পলাশের মনে হল চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে অন্ধকার পাহাড়ি এক গ্রামের ছবি... একটা পোড়া গির্জা... একটা বড় লোহার গেট... আর, আর একটা অদ্ভুত নক্সা... পাইনবনের মাঝে একটা গোরস্থান... খুঁটির সাথে বাঁধা জ্বলন্ত দেহ... আর্তনাদ করতে করতে পুড়ছে জীবন্ত মানুষ...

পলাশ আর নিতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল কে যেন তার সারা শরীরে অদৃশ্য ব্লেড দিয়ে চিরে দিচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। মনে হল চোখের সামনে ঘন অন্ধকার আর সে সেই গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে...

ঠিক তখনই... একটা নীল আলোর বিস্ফোরণ হল হঠাৎ। একটা প্রবল নীল আগুনের স্রোত আচমকা কাউকে কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে ঠিক ওদের মাঝখানে পড়ল, আর যে পলাশকে চেপে ধরেছিল সে সেই নীল আগুনের স্রোতে ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে মরণ আর্তনাদ করে উঠল। ভয়ঙ্কর আর্তনাদে আর পোড়া গন্ধে ভরে উঠল চারিদিক।

পলাশ দেখল দেহের দুইদিকে হাত প্রসারিত করে রণজয় শূন্য থেকে যেন লাফ দিয়ে ঠিক তার পেছনে এসে দাঁড়াল। সেই দুই হাতে জ্বলছে আশ্চর্য এক উজ্জ্বল নীল আগুন। খালি গা। মাখনের মতো ফর্সা ঈষৎ পেশীবহুল শরীরে সেই নীল আগুনের আলো প্রতিফলিত হয়ে আরও চকচক করে উঠছে।

পিঠের দিক থেকে বেরিয়েছে দুটো বিরাট বড় সাদা ডানা। সে দুটো তখনও তির তির করে কাঁপছিল। স্বর্গদ্বার রক্ষী সে। পিঠে ডানা তো থাকবেই। ডানহাতে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ঠিক পলাশের মতো প্যাঁচানো রুদ্রাক্ষের মালা। যার ভিতরে লুকিয়ে আছে জীবন্ত গড়ুর উল্কি। তার স্বর্গ দ্বার রক্ষী হওয়ার চিহ্ন। এই রণজয়কে একটু আগের রণজয়ের সাথে একেবারেই মেলানো যায় না। চোয়াল শক্ত। চোখে অদ্ভুত এক কাঠিন্য। রণজয়কে দেখেই লাকুনেরা একটু থমকে গিয়েছে। স্বর্গদ্বার রক্ষীর কথাটা তারা একদম আন্দাজই করতে পারেনি। তারা তাদের প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ওদের ঘিরে রাখা বৃত্ত ছোটো করে যেই এগোতে যাবে ঠিক তখনই যা হল তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না।

রণজয় চোয়াল শক্ত করে দুইহাত যেই তালির আকারে জড়ো করলও সাথে সাথে সেই নীল আগুন আচমকা ছড়িয়ে পড়ল ওর পিঠের দুইদিক থেকে বেরোনো সাদাডানা জুড়ে। সাথে সাথে একটা তীব্র নীল আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়তে লাগল জায়গাটা জুড়ে। সেই আগুনের হলকার আয়ত্তে যে নরকজীবেরা ছিল তারা চোখের নিমেষে পুড়তে লাগল। অনেকে নিমেষে পুড়ে ছাই হল, অনেকে আধজ্বলা হয়ে দূরে সরল, আবার অনেকে সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল।

পলাশ আর পারছিল না। সে ধপ করে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল।

— "আমায় ক্ষমা করে দে পলাশ। আমি তখন তোকে ওভাবে বারণ করতে চাইনি..." কিন্তু রণজয়কে মাঝপথে থামিয়ে পলাশ বলে উঠল, "তোর আমায় কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার নেই। তুই রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেছিস এই অনেক আমার জন্য। কিন্তু আমাদের হাতে একদম সময় নেই রণ। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাঞ্জাং যেতে হবে।"

— "কাঞ্জাং? মানে সিকিম?"

অবাক হওয়া রণজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পলাশ বিড়বিড় করে বলে উঠল, "হ্যাঁ, সিকিমের ওই গ্রামেই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে রণ। ওখানেই লুকিয়ে আছে।"
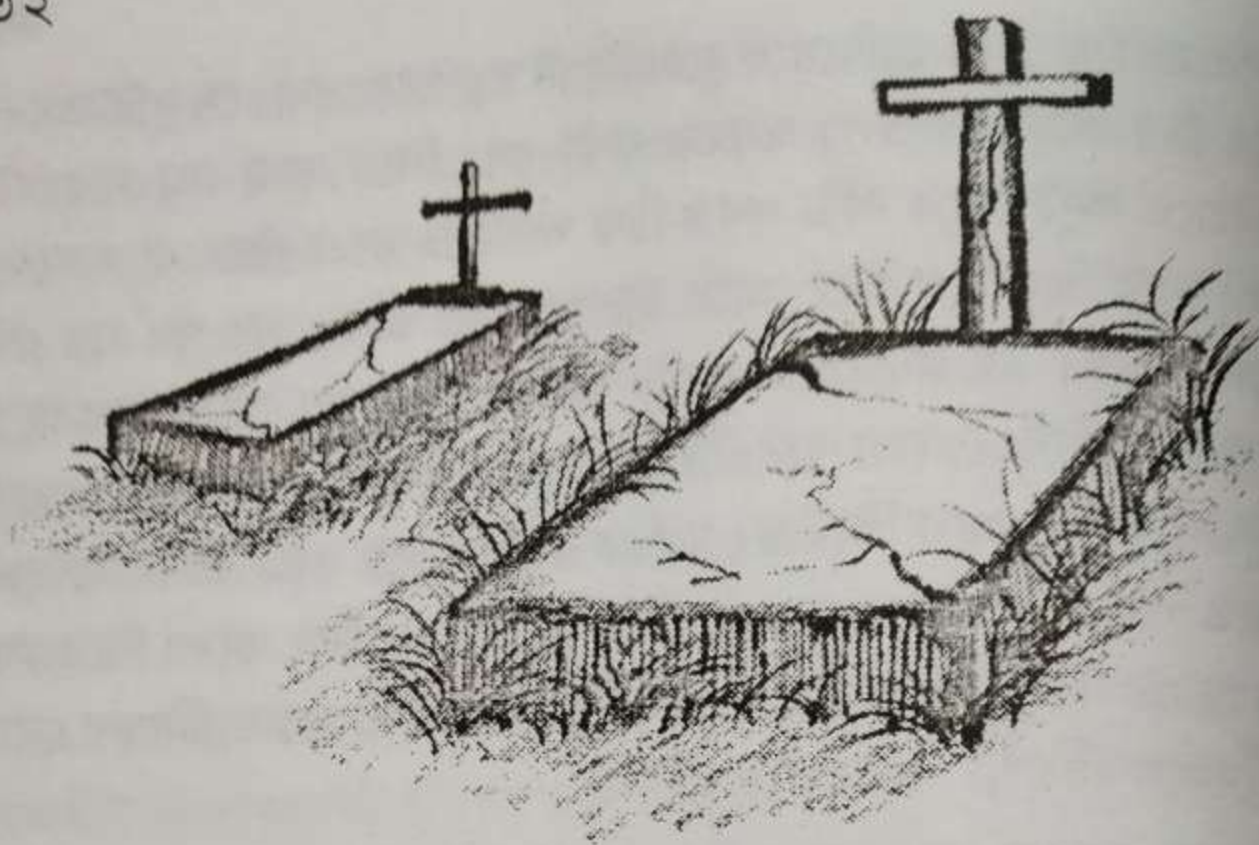
(৪)

।। পরিত্যক্ত কবরের পাদ্রী।।

সরু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ি ঢালে উঠতে গিয়ে গাড়িটা ভয়ঙ্করভাবে নেচে উঠতেই রণজয় পেছনের সীট থেকে বলে উঠল, "আঙ্কল-জী! থোড়া ধীরে চলাইয়ে! আপ তো গাড়ি খাইমে গিরা দেঙ্গে।" চালক ভদ্রলোক সেই কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে গাড়ি একই গতিতে চালাতে লাগল।

রণজয় বিরক্ত হয়ে পলাশের দিকে তাকাল। পলাশ তার পাশে বসে এক দৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে। কিছু ভাবছে পলাশ। সরু এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তা। দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে গেলে অনেক কসরত করে একে অপরকে পাশ দিতে হবে। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে অতল পাহাড়ি খাদ। যত উপরে উঠছে তত ঠান্ডা বাড়ছে। রণজয় আর পলাশ দু'জনেই গায়ে মোটা ওভারকোট চাপিয়েছে। রাতে নাকি আরও ঠান্ডা পড়বে।

এই সুমো গাড়িটা ওরা জোগাড় করেছে কাঞ্জাং যাওয়ার জন্য। ওদের ট্রেন লেট করায় রাতে ওরা মিরিকের একটি হোটেলে ছিল। ভেবেছিল আজ

সকালে সুমো স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি বুক করে ওরা কাঞ্জাঙের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কিন্তু স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যা শুনল তাতে ওদের চক্ষু চড়কগাছ। কোনও গাড়ি অজ্ঞাত কারণে কাঞ্জাঙের দিকে যাবে না। শুনে তো ওরা 'থ'! এ আবার কী? অনেক তর্ক-বিতর্ক চলল বেলা অবধি।

একসময় তো রণজয় আশা ছেড়েই দিল। কিন্তু পলাশ অবাক হল এদের আচরণ দেখে। যেই ড্রাইভার কাঞ্জাঙের নাম শুনছে ওমনি মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে তাদের। আর তারপরেই জানিয়ে দিচ্ছে ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কেউ বলছে রাস্তা খারাপ। কেউ বলছে তার গাড়ি খারাপ। কেউ বলছে গাড়িতে তেল নেই। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কারণ। পলাশ বুঝতে পারল এদের কাঞ্জাং না যাওয়ার পেছনে সম্পূর্ণ অন্য কারণ আছে যা কেউই বলছে না।

হোটেলের নীচেই রেস্টুরেন্ট। সেখানে সার সার চেয়ার টেবিল পাতা। খুব একটা ভিড় নেই সেখানে। দু-চারজন গোনা-গুণতি লোক বসে দুপুরের খাওয়া সারছে। ওরা কোনও উপায় না দেখে ভাবল দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেবে। পলাশ রণজয়কে নিয়ে একটা টেবিলে বসে লাঞ্চ অর্ডার করল।

— "এবার? এবার কী করবি?" রণজয়ের গলায় চিন্তার সুর, "গাড়ি না হলে তো যাওয়া যাবে না।"

পলাশের দুই চোখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। বাম হাতের কালশিটে দাগের ওপরে অজান্তেই চলে গিয়েছে ডানহাতের বুড়ো আঙুল।

— "কাঞ্জাংকে ঘিরে কিছু একটা তো হয়েছেই যা এদের মনে অদ্ভুত ভয় তৈরি করেছে।" কথা বলতে বলতে বড় জানালার বাইরে তাকাল পলাশ। সমগ্র উপত্যকা জুড়ে মেঘ আর কুয়াশার ঘন আস্তরণ নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

আর ঠিক তখনই সামনের টেবিলের লোকটি মুখ তুলে প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠল, "পুরা কাঞ্জাং শাপিত হো চুকা হ্যায়!"

রণজয় চমকে উঠল। কী বলছে সামনের বছর চল্লিশের লোকটা?

— "কী?" পলাশ লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলে উঠল, "পুরো কাঞ্জাং অভিশপ্ত হয়ে গেছে?"

— "সিরফ কাঞ্জাং নহি!" লোকটি গলার স্বর আরও নামিয়ে নিল,

— "পাহাড়িকে উস ছোড়মে রহনেওয়ালা কুলমিলাকর ছয় গাঁও হ্যায়। কাঞ্জাং, লেজিং, লোরথাং, রুবেন, লোরখা, ঔর কিমসিং। কাঞ্জাং কা কহর অব লেজিং কো ছু রাহা হ্যায়। সব কহতে হ্যায় বাকি গাঁওকী ভি ওহি হালত হোগি জো কাঞ্জাং কী হুই হ্যায়। ইসিলিয়ে ইহাকা কোই বান্দা পাহাড়িকে উশ ছোড় নহি যা রাহা হ্যায়। কুছ দিন প্যাহলে এক বচ্চা জিদ কারকে অপনে কুছ দোস্ত লেকর কাঞ্জাংকে তরফ নিকলে থে। উশ দিনকে বাদ উশ লড়কেকা ঔর উসকে দোস্তোকা কুছ অতাপতা নহি হ্যায়। এক খৌফকা কহর পুরে পাহাড় মে ছা রাহা হ্যায়। হালাত অব এয়সা হো চুকে হ্যায় কে লোক উশ জাগাহকা নাম লেনা ভি অবসকুন মানতে হ্যায়।"

— "এক মিনিট!" রণজয় বলে উঠল, "কহর! কীরকম কহর?"

— "আজ সে তিনদিন প্যাহলে পুরা কাঞ্জাংকে লোক লাপাতা হো গয়ে আচানক। কাহা গয়ে ওহ সব, কিসিকো নহি পাতা। রাহ গয়ে সিরফ উনকে খালি ঘর ঔর লোগোকে অধজ্বলে নাখুন, বাল।" কথা বলতে বলতে লোকটার ফর্সা মুখের প্রত্যেকটা পেশী কেঁপে উঠল যেন।

পলাশ একবার তাকাল রণজয়ের দিকে। রণজয়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্রমশ ঘন হচ্ছে।

— "তাহলে কাঞ্জাঙে এখন কেউ থাকে না?" পলাশ প্রশ্ন করে উঠতেই লোকটি বলে উঠল, "শুনা যাতা হ্যায়, গাঁও কে বাহার জো গির্জা হ্যায়, উহাকে পাদ্রী ফাদার ডেংপোকো কুছ নহি হুয়া ওউর ওহ উস গির্জা মেহি রহতে হ্যায়।"

পলাশ ফিরল রণজয়ের দিকে। "তুই বুঝতে পারছিস? আমি কেন বারবার কাঞ্জাং আসার কথা বলছিলাম। আমাদের কাঞ্জাং যাওয়াটা ভীষণ জরুরী। একটা গোটা গ্রামের লোক রাতারাতি উধাও! পড়ে রয়েছে শুধু আধপোড়া চুল আর নখ! আমার ইনটিউশন বলছে, কাঞ্জাংকে ঘিরে এক ভয়ঙ্কর রহস্য ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে রণ। সেই রহস্য ভেদ করতে না পারলে এক বিধ্বংসী সর্বনাশ সব কিছু শেষ করে দেবে রণ।"

— "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু যাবি কী করে?" রণজয় পলাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

— "শুনতেই তো পেলি এখানকার কোনও ড্রাইভার ওইদিকে যাচ্ছে না। তাহলে?"

ঠিক এমনসময় পলাশ চিমটি কেটে রণকে কী একটা দেখবার জন্য ইঙ্গিত করল, রণ পলাশের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল সামনের লোকটি যেখানে বসে খাচ্ছিল সেই টেবিলেই একটি গাড়ির চাবি। উরেব্বাস! লোকটির তার মানে গাড়ি আছে।

— "আপনার কাছে গাড়ি আছে?"

লোকটি কিছু না বলে মাথা নাড়াল।

— "আপনি আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন? আমরা কিন্তু গাড়ি ভাড়ার জন্য যত লাগবে তত দিতে রাজি আছি।"

লোকটি চোখ তুলে তাকাল, "ম্যায় উস তরফ হি যা রাহা হুঁ। আপ লোগ আ সকতে হ্যায়। পর উসসে পহলে আপ বাতাইয়ে আপলোগ কাঙ্গাং কিউ জানা চাহতে হ্যায়?"

পলাশ কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই রণজয় বলে উঠল, "আমরা রিপোর্টার। কাঙ্গাঙে হওয়া এই রহস্যের সমাধান করতে আমাদের পাঠানো হয়েছে অফিস থেকে। এই নিয়ে একটা স্টোরি করতে হবে আমাদের।"

লোকটি কি রণজয়ের কথা বিশ্বাস করল? কে জানে? মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না। পলাশ বুঝল রণ আসল কথাটা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে চায় না। হঠাৎ পলাশের কী একটা মনে হতেই প্রশ্নটা করে বসল, "পর আপ উহা পর কিউ জানা চাহতে হ্যায়?"

লোকটা পলাশের কথা শুনে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ম্যায় আপনে বেটে কো ঢুন্ডনে কে লিয়ে উশ তরফ যা রাহা হুঁ।"

— "আপনার ছেলে?" রণজয় অবাক।

— "দো দিন পহলে দোস্তকে সাথ লাপতা হোনেওলা লড়কা ওর কোই নহি মেরা লউতা বেটা থা।"

* * * * * * * * * *

— ঠিক এমন সময় গাড়িটা ফের ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল।
রণজয় ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল একরকম ভাবে, "আঙ্কলজী, আস্তে!"
— "আপ লোগোকো বতায়াথা না। সানসেট কে পাহলে হমে কাঞ্জাংকে উস গির্জা তক পহচ জানা হোগা!" ভদ্রলোকের মুখে স্পষ্ট অশান্তির ছাপ, "আপ শহরকে লোগ কোই বাত নহি শুনতে।"
সূর্য একটু আগেই অস্ত গিয়েছে। পাহাড়ে সূর্যাস্তের পর বেশ কিছুক্ষণ সূর্যের আলো রয়েই যায়। কিন্তু হিসেব মতো এখনো দুই কিলোমিটারের দূরত্বে কাঞ্জাং। কথা বলতে বলতে জানা গেল চালক ভদ্রলোকের নাম হেমেন্দ্র শিমিক। উনি বিড়বিড় করে অনেকবারই বলেছেন পলাশ আর রণজয় দু'জনেই মিরিক থেকে বেরোতে দেরি করে ফেলেছে। আসলে ওদের তো এরকম তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর কোনও প্ল্যান ছিল না। সারা রুমেই জিনিসপত্র ছড়ানো ছেটানো ছিল। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজেই দু'জনে জিনিসপত্র গুছিয়ে নীচে নেমে হোটেলের বিল মেটাতে মেটাতে একঘণ্টা মতো লেগেই গেল।
ঠিক এমন সময় পলাশ আপনা থেকেই রণজয়ের দিকে তাকাল, — "একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। যেখানে পুরো কাঞ্জাঙের লোকজন রাতারাতি কর্পূরের মতো উবে গেল সেখানে ওই গির্জার পাদ্রী কীভাবে বেঁচে গেলেন?"
— "সেটা ওই গির্জায় বা ওই পাদ্রীর সাথে দেখা না করার পর্যন্ত জানা যাবে না। কিন্তু আমার মাথায় অন্য কথা ঘুরছে।" রণজয় ফিসফিস করে বলে উঠল, "আমরা এমন এক জিনিসের মুখোমুখি হতে চলেছি তার আচার উপাচার সম্পর্কে আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনও ভুল করে বসছি না তো?"
— "তুই ঠিক কী বলতে চাইছিস?" পলাশ অবাক হয়ে তাকালো। দেখতে দেখতে ওদের গাড়ি ঘন পাইন বনে প্রবেশ করল। এখানে কাঁচা রাস্তা পাইন বনের ছায়ায় বেশ অন্ধকার।
— "এবারে আমাদের সামনে এমন কিছু দাঁড়িয়ে আছে, যা আমাদের অভ্যাসের অন্তর্গত নয় পলাশ। আমরা হিন্দু। মন্দির, বিগ্রহ, তন্ত্রমন্ত্র, সাধু সন্ন্যাসী, তেত্রিশ কোটি দেবদেবী এসবের মধ্যেই আমরা জন্মেছি আর বেড়ে

উঠেছি। এটাই আমাদের বিশ্বাস। আর এই একনিষ্ঠ বিশ্বাসই আমাদের শক্তি। কিন্তু এবারে আমাদের মুখের সামনে একে একে দাঁড়িয়ে আছে বাইবেল, গির্জা, ক্রুশ, বাইবেলে বর্ণিত নরক থেকে উঠে আসা শয়তানেরা। যা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত। আমরা নিজেরা যতক্ষণ না গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে অন্য ধর্মকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা সেই ধর্মের শক্তি প্রার্থনা করবো কীভাবে? আমি নিজে এই ব্যাপারে কতটা উদারমনস্ক সেটা নিয়ে আমার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে।"

— "দ্বিধা রাখিস না রণ।" পলাশ রণজয়ের হাত চেপে ধরল, "মনে কোনও দ্বিধা রাখিস না। একটা কথা মাথায় রাখবি, অশুভের বিরুদ্ধে শুভর লড়াই সব ধর্মের জন্যই চিরন্তন চলে আসা এক সংগ্রাম। ধর্ম, তার আচার অনুষ্ঠান, তার প্রথা, সব কিছু ভুলে যা তুই। শুধু ওই সৃষ্টিকর্তা পরম শক্তিশালী ঈশ্বরকে মনে রাখ।"

— "ও দেখিয়ে কাঞ্জাং!"

হঠাৎ পাইনবনের ভেতর থেকে দূরের পাহাড়ের গায়ে কতগুলো ছোট ছোট বাড়ি দেখা গেল। মিঃ শিমিক সেই দিকেই আঙুল দেখাচ্ছিলেন। পলাশ রণর হাতখানা চেপে বলল, "চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আর ঠিক তখনই ওদের চিন্তার মধ্যে ফেলে গাড়িটা মাঝপথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। মিঃ শিমিক বারবার চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু একটা যান্ত্রিক ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না গাড়ি থেকে।

— "গাড়ি স্টার্ট নহি হো রাহা হ্যায়!" মিঃ শিমিকের মুখ দেখে মনে হল তিনি ভয়ঙ্কর চিন্তায় পড়েছেন।

রণজয় অবাক হওয়া মুখে বলে উঠল, "এরকম চলতে চলতে আচমকা বন্ধ? স্ট্রেঞ্জ!"

মিঃ শিমিক একবার বাইরের দিকে তাকালেন। পাইন বনের ভেতরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। তিনি দরজা খুলে বাইরে নেমে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "হমলোগোকে পাস টাইম নহি হ্যায়। হমে পায়দল নিকল না চাহিয়ে!"

মিঃ শিমিকের মুখে এক অন্য রকমের ভয় দেখল পলাশ আর রণজয়। তারা

কথা না বাড়িয়ে নিজেদের ব্যাগপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই হাড়কাঁপানো কনকনে ঠান্ডাটা টের পেল দু'জনেই।

মিঃ শিমিক ঝটপট গাড়ির সবকটা দরজা বন্ধ করলেন।

ওদিকে গাছের ছায়ায় অন্ধকার আরও গাঢ় হচ্ছে। রণজয় আর পলাশ পিছন পিছন হাঁটছিল, সামনে মিঃ শিমিক। ওদের এর আগে চড়া খাড়াই বেয়ে ওঠার অভ্যেস একেবারেই ছিল না। তারপরে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, পাইনবনে সন্ধের অন্ধকার সব মিলিয়েই অবস্থা প্রতিকূল ওদের দু'জনের জন্যই।

— "রণ!" ঠিক এমন সময় পলাশের গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রণজয়। মিঃ শিমিকও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন পলাশের গলা শুনে। জায়গাটা জুড়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানে থাকা সত্যি বিপদ্দজনক। অন্ধকার হলেই বনের পশুরা বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ওকী? পলাশ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পাইনবনের ঢালে ঝুঁকে ঝুঁকে কী দেখছে?

— "কিরে? কী দেখছিস?" রণজয় পলাশের কাছে পৌঁছতেই পলাশ আঙুল তুলে নীচের দিকে ইঙ্গিত করল।

অন্ধকারে খুব একটা কিছু পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা গেল পাইনবনের ভেতর দিয়ে একটা সরু পাথরে বাঁধানো রাস্তা অনেকটা নীচে নেমে গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা গোল মতো জায়গায় গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ি ঢালের ঘন পাইনবনের মাঝে এই জায়গা সত্যি বিসদৃশ। পাহাড়ের ঢালে যেখান থেকে রাস্তাটা শুরু হয়ে নেমে গিয়েছে নীচে তার মুখেই কালো কালো কাপড় টুকরো করে গাছগুলোর সাথে দড়ি দিয়ে প্যাঁচানো।

— "ক্যায়া হুয়া?"

মিঃ শিমিক কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউই খেয়াল করেননি।

— "পাহাড়ের ঢালে ওরকম গাছ কেটে ফাঁকা জায়গাটা কেন?"

— "পতা নহি। পর..." কথা বলতে গিয়ে মিঃ শিমিক হঠাৎ থেমে গেলেন। রণজয় একবার আড়চোখে পলাশের দিকে তাকাল। পলাশ স্থির দৃষ্টিতে মিঃ শিমিকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

— "ইয়েহ সায়দ কোই সিমেট্রি হ্যায়। পর ইয়ে কপড়ে কে টুকরে..."

— "কী?"

— "ইয়েহ কালে কপড়ে কে টুকরে বাতা রহে হ্যায় ইয়েহ কবরস্থান অ্যাবাডান্ট হ্যায়। কোই ইস্তেমাল নহি করতা ইসে।"

— "পরিত্যক্ত গোরস্থান!" রণজয় বেশ অবাক হল। সে পলাশের মুখের দিকে তাকাল। পলাশ আচমকা বলে উঠল, "আমি ওখানে যাব।" চমকে উঠল রণজয়। চমকে উঠলেন মিঃ শিমিক।

— "পাগল হো গয়ে হ্যায় ক্যায়া? অন্ধেরা ছা রাহা হ্যায়। এক মিনিট ভি ইহা রহনা খতরে সে খালি নাহি হ্যায়।"

— "পলাশ আমার মনে হয় উনি ঠিক বলছেন। দেখ অন্ধকার হয়ে আসছে। আর..."

— "প্লিজ রণ! আমার মনে হচ্ছে একবার আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার।"

— "আপলোগ সমঝ কিউ নহি রহে হ্যায়! ইয়ে মজাক নহি হ্যায়।"

— "অঙ্কলজী আপনি এগিয়ে জান। আমরা আসছি।" কথাটা বলেই পলাশ আর দাঁড়ালো না। পাথুর বাঁধানো পথটা বেয়ে নীচে নামতে লাগল দ্রুত। রণ কথা না বাড়িয়ে তার পিছু নিলো। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নীচে নামা তাই দু'জনেই দ্রুতগতিতে নেমে চলছে নীচের দিকে।

জায়গাটা পাহাড়ি ঢাল হলেও কিছুটা সমতল। বোঝা যাচ্ছে গোরস্থান বানানোর জন্য একসময় পাহাড়ের ঢালের পাইন গাছ কেটে মাটি ফেলে জায়গাটা সমতল করা হয়েছে। মাথার ওপর পাইন পাতার আস্তরণ না থাকায় জায়গাটা কিছুটা আলোকিত। কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় আগাছা আর ঝোপ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।

— "হঠাৎ এখানে এলি কেন?" রণজয় পলাশের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করতেই পলাশ চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফেরাল।

— "জানি না! বারবার মনে হচ্ছিল এখানে আসা দরকার। আয় তো একটু ভেতরে গিয়ে দেখি।"

কথাটা বলে যেই দু'জনে পাথরে বাঁধানো পথ থেকে নেমে সিমেট্রির আগাছা ভরা জমিতে পা রাখল ওমনি পায়ের নীচের মাটিতে একটা চাপা

গুড়গুড় অনুভূতি। এ কি ভূমিকম্প নাকি?

রণজয় পলাশের হাত চেপে ধরল, "চল! একমুহূর্ত এখানে না। মাটি কাঁপছে।"

— "না দাঁড়া!" পলাশের চোখ মুখে তখনও নাছোড়ভাব। "এটা ভূমিকম্প নয়। অন্য কিছু।"

— "যাই হয়ে থাক। এখানে আর একমুহূর্ত নয়।" রণজয়ের গলার স্বর গম্ভীর। "তুই বুঝতে পারছিস না। এখানে থাকা ঠিক নয়।"

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই কী একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে কথা আটকে গেল রণজয়ের। ও পলাশের পেছনে দিকে অবাক চোখে কী একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে। পলাশ সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরল। আর যা দেখল তাতে একটা ঠান্ডা শিরশিরে অনুভূতি মেরুদণ্ড বেয়ে যেন নীচে নেমে গেল।

পলাশের পেছনেই একটা সমাধির উঁচু ফলক। আলো কমে আসছে, কিন্তু ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল ফলকের মাথা থেকে কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে। আপনা থেকেই। শুধু এই সমাধিতেই নয়। সব সমাধিরই একই অবস্থা। তারপর আচমকা সেই রক্তের লাল রঙ বদলে গেল কালো রঙে।

— "পলাশ চল।" একটা কটু চামড়া পোড়া গন্ধে ভরে উঠছে চারিদিক। রণজয় চিৎকার করে উঠল, "পলাশ, চলে আয়। চলে আয়।"

পলাশ দেখল রণজয় পাথুরে রাস্তাটা ধরে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। পায়ের নীচের মাটির কম্পনটা বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে বিকট চামড়া পোড়া গন্ধ। পলাশ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে রণর পিছু নিলো।

পিঠে ভারী ব্যাগ। সরু পথ বেয়ে চড়াই এ উঠতে খুব অসুবিধে হচ্ছে, তারপরে হাতের ট্যাটুটা ভয়ঙ্করভাবে জ্বলছে। রণজয় ওর আগে আগেই। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মাথার ওপরে পাইন পাতার অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে।

পলাশ ছুটতে ছুটতে হাঁপাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। রণজয় ওর আগে আগেই। ঠিক চওড়া রাস্তার মুখের কাছে এমন সময় পলাশের চোখের সামনে পুরো জায়গাটা যেন দুলে উঠল। একটা দৃশ্যপট যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল আচমকা। ঠিক যেমনভাবে ভেসে উঠেছিল সেই শিউলিদের বাড়ির ভেতরে।

একজন পাহাড়ি মহিলা অন্ধকারে একটা গোরস্থানের ভেতরে একটা সমাধির

সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। তার কাঁধে একটা লাল কাপড়ের থলে। হাতে একটা শাবল গোছের কিছু। দূরে একটা সমাধির বাঁধানো বেদীর ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। মেয়েটা যেই সমাধির সামনে বসেছিল ঠিক সেখানেই আচমকা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। কিছুটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলে মেয়েটি লাল থলের ভেতর থেকে বের করে আনল একটি হাড় যার মধ্যে তখনও মাংস রস লেগে চটচট করছিল জিনিসটা। সে সেই হাড়টা গর্তের মধ্যে ফেলেই মাটি চাপা দিলো।

কাজটা করেই মেয়েটা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র পাঠ করল। আর ঠিক তখনই পিছনে কোথাও কোলাহল শোনা গেল। সম্মিলিত বহু কণ্ঠের গর্জন। মেয়েটি চোখ খুলে চটপট উঠে দাঁড়াল। সম্মিলিত চিৎকারটা বাড়ছে পেছনে। মেয়েটার মুখ দেখে মনে হল সে ভয় পেয়েছে। সে একমুহূর্ত ওখানে না দাঁড়িয়ে অন্ধকার পাইনবনের ভেতরে হারিয়ে গেল। গোটা দৃশ্যটা পলাশের চোখের সামনে সিনেমার মতো ফুটে উঠল।

আর ঠিক তখনই একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল হাতের কব্জিতে। সাথে সাথে চোখের সামনে থেকে দৃশ্যটা সরে রণজয়ের মুখটা ভেসে উঠল।

— "কীরে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আয়!" পলাশ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের গোরস্থানটিকে দেখল একবার। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "চল।"

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওপরে উঠে আসতেই হাতের উল্কির জ্বালাটা কমে গেল। কিন্তু একীই? মিঃ শিমিক কই?

— "উনি চলে গেলেন? অদ্ভুত লোক তো!" রণজয় চারিদিকে চোখ ফেরালো।

পলাশ তখনও দৃশ্যটা সম্পর্কে ভাবছিল। সে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, "আমারাই ওনাকে চলে যেতে বলেছিলাম মনে করে দেখ। নে চল, আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যাই। সন্ধ্যা হতে যায়।"

কিছুক্ষণ পর কাঁচা চড়াই পথ পাড়ি দিয়ে রাস্তার বামদিকে পাইনবনের মাঝখানে একটা টিন আর কাঠের দোতলা বড় বাড়ি দেখা গেল। ঘরটা লম্বা, দরজা জানালা সব বন্ধ। কাঠের বেড়া দেওয়া ঘরটির ভেতরে কেউ থাকে কিনা সন্দেহ। একফালি বাগান করা ছিল কোনও একসময় তাও অযত্নে

অবহেলিত। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে।

রণজয় আর পলাশ ধীরে ধীরে কাঠের বেড়ার দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল সদরের দরজার ওপরে একটা কাঠের ক্রুশ লাগানো। এটাই তাহলে গির্জা। যার পাদ্রী ফাদার ডেংপো। কিন্তু দরজা জানালা এভাবে বন্ধ কেন? আর মিঃ শিমিক? তিনি কই?

রণজয় দরজার কড়া নাড়াল। 'ঠক্! ঠক্! ঠক্!' নির্জন প্রকৃতিতে বড় বিসদৃশ শোনাল। না, দরজা খোলার কোনোরকম সাড়া বা আওয়াজ ভেতর থেকে আসছে না।

রণজয় এবার আরও জোরে জোরে কড়া নাড়াল। 'ঠক্... ঠক্... ঠক্!'

পলাশ চিৎকার করে উঠল, "কেউ আছেন ভেতরে? কোই হ্যায়?"

— "আছে তো বটেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।"

— "ফাদার ডেংপো! ফাদার ডেংপো!" পলাশ আবার চিৎকার করে উঠল, "দরজা খুলুন। দরওয়াজা খোলিয়ে।"

— "কী করবি বলতো?" বেশ কিছুক্ষণ পরেও কোনও সাড়া না আসায় রণজয় অসহায় মুখে প্রশ্নটা করলও।

পলাশ নিজেও বুঝতে পারল না কী করবে। আর ঠিক তখনই দরজার ফাঁক গলে কাঁপা কাঁপা হলুদ আলো দেখা গেল। আর দরজার উলটোদিকে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ।

দরজাটা একটা কেঠো শব্দ করে খুলে যেতেই দেখা গেল দরজার ভেতর দিকে একজন প্রৌঢ় হাতে মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখের ওপরে মোটা লেন্সের চশমা। পরনে ফাদারের কালো আলখাল্লা। গলায় রুপোর চেন। তার লকেটটা পাতলা চাদরের আস্তরণের আড়ালে লুকানো।

— "কী চাই?" ভদ্রলোকের অদ্ভুত ফ্যাসফেঁসে গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল দু'জনেই।

— "আপনিই ফাদার ডেংপো?" পলাশ প্রশ্নটা করতেই ভদ্রলোক সম্মতির সুরে মাথা নাড়ালেন।

— "আপনারা কে?" ফাদার অবাক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা

করতেই রণজয় বলে উঠল, "আমরা, একটু আগে এখানে আসা মিঃ শিমিকের সঙ্গে এসেছি। উনি নিশ্চয় আপনাকে আমাদের কথা বলেছেন।"

কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে ফাদার ডেংপো যা বললেন তাতে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওরা দু'জন। ফাদার ডেংপো ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, "কে মিঃ শিমিক? এখানে তো এই নামের কেউ আসেননি।"
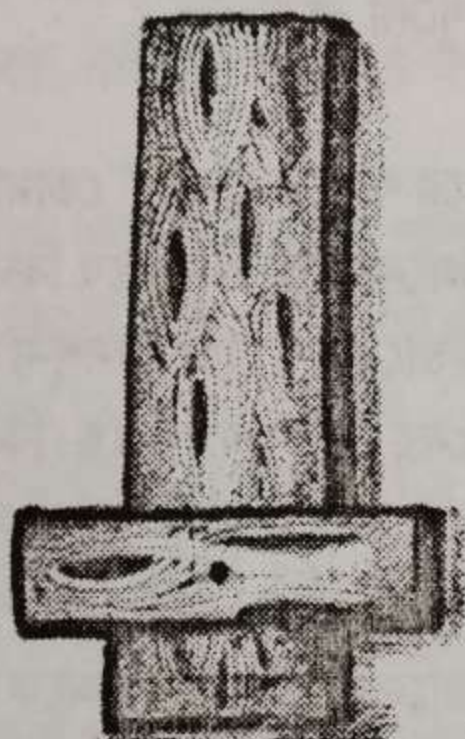
(৫)

।। অশুদ্ধ রক্তের উপাখ্যান।।

ফাদার ডেংপো টেবিলের ওপরে মোমবাতিটা রাখতেই হলদেটে কাঁপাকাঁপা আলোয় ঘরের ভেতরটা কিছুটা পরিষ্কার হল। ছিমছাম ছোট ঘর। কিন্তু একটা গুমোট গন্ধ ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে। দীর্ঘদিন দরজা জানালা বন্ধ রাখার ফল। রণজয় দেখল ঘরে একটাই মাত্র জানালা। তাও বন্ধ করে ভারী পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

— "তোমরা আজকের রাতটা এই ঘরে থাকতে পারো। এটা আমি আমার স্টাডিরুম হিসেবে ব্যবহার করি।" আগের মতোই পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেও বোঝা গেল এনার ভাষায় অদ্ভুত একটা পাহাড়ি টান রয়েছে।

— "এটা গির্জা নাকি আপনার বাড়ি?" পলাশ অবাক হয়ে প্রশ্নটা করতেই ফাদার বিড়বিড় করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, —"এটা আদপে গির্জাই। আমি নীচের তলাটা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করি। ঢোকবার মুখে বাঁদিক দিয়ে যে কাঠের সিঁড়ি দেখলে ওটা দিয়ে ওপর তলায় প্রেয়ার রুমে যাওয়া যায়। নীচের এই যে ঘরগুলো দেখছ এর একটাতে আমি গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল চালাতাম। আর একটা আমার থাকার ঘর। তোমরা

পোশাক পালটে নাও। আমি তোমাদের জন্য খাবার আর গরম জল আনছি।”

ফাদার ডেংপো বেরিয়েই যাচ্ছিলেন, এমন সময় রণজয় পেছন থেকে বলে উঠল, “ফাদার, এই ঘরের জানালাটা কি কোনও ভাবে খোলা যাবে? আসলে বদ্ধ ঘরে মোমবাতির ধোঁয়ায়... একটা স্যাফোকেশন হচ্ছে।”

রণজয়ের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ফাদার বলে উঠলেন, — “একদম না। সূর্যাস্তের পরে এই গির্জার কোনও দরজা জানালা খোলা যাবে না। প্রাণে বাঁচতে চাইলে এই জানালা একেবারেই খুলো না।”

— “মানে?”

রণজয়ের প্রশ্নে ফাদার ডেংপো গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, “তোমাদের বয়স কম, তার ওপরে সাংবাদিক। সবকিছু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে চাও। তোমরা হয়তো ভাবছ কাঞ্জাং যে এইভাবে রাতারাতি জনশূন্য হয়ে গেল তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উগ্রপন্থী সংগঠনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু তোমরা জানো না, এসব কিচ্ছু না। কাঞ্জাঙে যা হয়েছে আর বাকি গ্রামগুলোতেও যা হচ্ছে তার কারণ এখানকার লোকেদের পূর্বের পাপ। ওদের পাপের ফলেই এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ গ্রাস করছে এই পাহাড়ের প্রত্যেকটা গ্রামকে।” শেষের দিকের কথাগুলো বলতে বলতে আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ফাদার ডেংপো। হঠাৎ পলাশের অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, “তোমরা পোশাক পালটে ফেলো। আমি এখনই আসছি। তারপর তোমরা চাইলে আমার সাথে উপরের প্রার্থনা কক্ষে যেতে পারো।” কথাটা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

— “ফাদারের গলার স্বরটা একটু অদ্ভুত ধরনের না?” রণজয় বিড়বিড় করে প্রশ্নটা করে উঠল।

— “আমার কী মনে হয় জানিস, এখানে অনেকগুলো রহস্য একসাথে জট পেকে আছে!” পলাশ ফাদারের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠতেই রণজয় মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল, “আর খুব সাবধানে সেই জট ছাড়াতে হবে আমাদের। আর আমাদের হাতে সময় শুধু আজকের রাতটুকুই।”

* * * * * * * * *

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই একটা অন্ধকার হলঘর চোখে পড়ল পলাশ আর রণজয়ের। অন্ধকারাচ্ছন্ন হলঘরের শেষ প্রান্তে মিটমিট করে কতগুলো মোমবাতির ক্ষীণ আলো জ্বলছে। কাঠের মেঝের ওপর সস্তার মোটা কার্পেট পাতা। বোঝাই যায় এর ওপরে বসেই সকলে প্রার্থনা করে। রণজয় আর পলাশ ধীর পায়ে ফাদার ডেংপোর পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল। মোমবাতির প্রতিফলিত হালকা হলদেটে আলোয় দেখা গেল উলটোদিকের দেওয়ালে একটা বড় ক্রুশ ঝুলছে। কিন্তু একী! ওরা দু'জনেই ভীষণ অবাক হল। সেই ক্রুশ ওলটানো?

— "ফাদার, একী ক্রুশ এভাবে ওলটানো কেন? ওলটানো ক্রুশ তো অশুভ ইঙ্গিত।"

— "কাঞ্জাং নিজের বুকে যে পাপ করেছিল বহুবছর আগে পরমেশ্বর প্রভু সেই পাপ হয়তো ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন। সমস্ত কিছু ঠিকই ছিল বহুদিন। কিন্তু এত বছর পরে ফের কাঞ্জাঙে এমন এক উপাচার হয়েছে যা ঈশ্বরবিরোধী। আর তবে থেকেই এই গির্জার পবিত্র ক্রুশ উলটে গিয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও ক্রুশটিকে সোজা করতে পারিনি। গোটা কাঞ্জাঙের ভূমি অশুদ্ধ আর অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর এখনতো শুনছি সেই অভিশাপ কাঞ্জাং ছাড়িয়ে পাহাড়ের বাকি গ্রামগুলোও ছুঁয়ে ফেলছে।" শেষের দিকে কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ফাদার।

— "ফাদার, আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।" রণজয় কথাটা বলে পলাশের দিকে তাকাল।

—"কাঞ্জাঙে বহুবছর আগে কি পাপ হয়েছিল? আর এখনই বা কী উপাচার হয়েছে?"

ফাদার রণজয়ের কথা শুনে অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলে উঠলেন, "এই কাহিনী লোকের মুখেই আমার শোনা। কাঞ্জাং সহ পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে আগে দুই ধর্মের লোক একসাথে বসবাস করত। হিন্দু আর খ্রিস্টান। শান্তিপূর্ণ সহবাস ছিল তাদের। কাঞ্জাঙের নীচে নদীর তীরে বসবাস করতো এরকমই এক ধনী খ্রিস্টান পরিবার। স্বামী, স্ত্রী আর একজোড়া যমজ ছেলে মেয়ে। একদিন কী যে হল, আচমকা গ্রামের হিন্দু পরিবারের বাচ্চারা নিখোঁজ হতে লাগল। ওই

পরিবারে কাজ করতো গ্রামেরই এক মহিলা। মালকিনের কিছু রহস্যজনক গতিবিধি দেখে সে ঘটনাটা গ্রামের মুরুব্বিদের এসে জানায়। তারপর ডাইনি সন্দেহ করে গ্রামের হিন্দুধর্মের লোকেরা সেই মহিলাকে তাঁর স্বামীসহ গ্রামের মধ্যে থাকা গির্জার মধ্যে প্রভুর সামনেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। আর গির্জাটিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। এত বড় পাপ করবার পর আশেপাশের গ্রাম থেকে যত খ্রিস্টান পরিবার ছিল সবাইকে একবস্ত্রে তাড়িয়ে দেওয়া হয় চিরকালের জন্য। আর চিরকাল কাঞ্জাংসহ এই পাহাড়ের পাঁচখানা গ্রামের ভূমি চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় খ্রিস্টানদের জন্য।"

— "শুধুমাত্র সন্দেহের বশে একজনকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে গির্জার ভেতরে পুড়িয়ে মারা? কী নৃশংসতা!"

রণজয়ের চোয়াল শক্ত হচ্ছে। পলাশ বলল, "আপনি বললেন ওদের পরিবারের যমজ ছেলেমেয়ে ছিল। তাদের কী হল?"

— "ওদেরকে নাকি তারপর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বলা হত ওরা নাকি হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য। কিন্তু... কিছুদিন আগে এমনকিছু ঘটল যাতে এই গল্প এত বছর পর সম্পূর্ণ অন্য মোড় নিল।"

পলাশ তাকাল রণজয়ের দিকে। রণজয়ের কপালের ভাঁজ গাঢ় হচ্ছে মোমবাতির আলোয়।

— "তোমরা রিপোর্টার মানুষ। তোমরা জানবে কাঞ্জাঙের প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে পর্যটকদের ভিড় চিরকাল এখানে লেগেই থাকে। কিন্তু শীতকালে পথ দুর্গম আর পাহাড়ি চিতাবাঘের আক্রমণ বাড়ায় এইসময় কাঞ্জাং কোনরকম টুরিস্ট নেয় না। কিন্তু হঠাৎই কয়েকদিন আগে একজন পর্যটক হাজির হয়। সন্ধ্যের মুখে। ঠিক এই গির্জার দোরগড়ায়। লোকটিকে সাধারণ আর পাঁচজন পর্যটকের মতো দেখতে হলেও তার চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত ছিল। ঠিক যেন ছাই চাপা আগুন।"

— "সন্ধে হয়ে যাওয়ায় সেই পর্যটক আমার কাছে এসে অনুরোধ জানায় সে আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়। আমি তখন তাকে জানাই যে গ্রামে অনেক হোমস্টে আছে সে তাদের মধ্যে একটিতে আশ্রয় নিতেই পারে। গির্জা

অসহায়কে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই হোম-স্টে এই গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা। আমি ধর্মের দোহাই দিয়ে ওদের পেটে লাথি মারতে পারি না। ও তখন প্রার্থনা কক্ষে যাওয়ার অনুমতি চায়। আর আমি এতে কোনও খারাপ কিছু দেখতে পাই না। সকলেই পবিত্র পিতার সন্তান। আমি ওকে এই ঘরে নিয়ে আসি। ও হাঁটু গেড়ে নিজের মনেই কিছু প্রার্থনা করে। ওর ভাব আচারের বিশুদ্ধতা দেখে বুঝতে পারি ও খ্রিস্টান। কিছুক্ষণ থাকে তারপর সন্ধের অন্ধকার গায়ে মেখেই বেরিয়ে যায় গির্জা থেকে। আমি যাওয়ার সময় ওকে গ্রামে যাওয়ার রাস্তা বলে দিই। কিন্তু কী একটা কাজে এই ঘরে ফিরে এসেই যা দেখি তাতে আমার সারা শরীরে আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। বুঝতে পারি কিছু একটা ভয়ঙ্কর ঘটতে চলেছে। যে ক্রুশ এতদিন তাঁর সঠিক অবস্থানে ছিল সেটা ওই পর্যটকের বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই পুরো উলটো হয়ে অবস্থান করছিল। এ শয়তানের আগমনের ইঙ্গিত। বারবার মনে হয়েছে আমি তখনই গ্রামে গিয়ে সকলকে সাবধান করি। জানাই যে এই পর্যটকের আগমনে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। আর তার ইঙ্গিত পরমপিতা আমায় দিয়েছেন। ভাবলাম সকাল হলেই ওদের জানাবো, পুরোটা বুঝিয়ে বলব। সকলে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না কিন্তু কিছুজন তো করবে। আর সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল।”

— “কেন? কী হয়েছিল পরের দিন?” রণজয় অবাক হয়ে যাওয়া গলায় প্রশ্নটা করতেই ফাদার ডেংপো আরও ধীর গলায় বলে উঠলেন,

— “ভোরের দিকে চোখটা লেগে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎই দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভাঙে আমার। দরজা খুলে দেখি আমারই স্কুলের একটি বাচ্চা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে হাঁপাচ্ছে। বুঝতে পারি ছেলেটি দৌড়ে এসেছে। আমায় জানালো, গ্রামের পোড়ো গির্জায় কিছু একটা হয়েছে। সকলে আমায় ডাকছে। আগের রাতের টাটকা স্মৃতিতে একটা অজানা আতঙ্কে বুকটা ফের কেঁপে ওঠে আমার। আমি একমুহূর্ত সময় ব্যয় না করে ছেলেটির পেছন পেছন গ্রামের দিকে ছুটে যাই আর গিয়ে যা দেখি তাতে ঘটনার বীভৎসতায় বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে আমার।

পোড়া গির্জার বাইরে গ্রামবাসীদের জটলা। সকলের মুখেই এক অবর্ণনীয় ভয়। আমি সেখানে পৌঁছতেই সকলে আমায় পথ ছেড়ে দিলো। আর তখনই দেখতে পেলাম। দীর্ঘদিন আগে বন্ধ করে দেওয়া সেই গির্জার দরজা কে যেন খুলে দিয়েছে। আর...”

— “আর?”

— “আর সেই খোলা দরজার চৌকাঠে ঝুলছে সেই পর্যটকের কাটা মুণ্ডু। কেউ অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে পর্যটকের মুণ্ডু কেটে চৌকাঠের বাইরে টাঙিয়ে রেখেছিল। আমি ভিতরে গিয়ে এমন কিছু জিনিস দেখি, যা দেখে মনে হয় ওখানে অত্যন্ত অশুভ উপাচার হয়েছে কোনও। আর তখনই জানতে পারি পর্যটক রাত্রে গ্রামেরই অধিবাসী নবীন শেরপার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। নবীনের ছেলে বউমা বহুদিন আগেই মৃত।তার স্ত্রী এই গ্রামে নাতি খাইসানের সঙ্গে থাকত। খাইসানের এক যমজ ভাই আছে, নাম বোরহান। শুনেছি কলকাতায় পড়াশোনা করে। সকালে নাকি গির্জার বাইরে খাইসানকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় ভোরের দিকে। পরে জানা যায়, গির্জার ভেতরে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যটক তাকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছিল। আর দেরি না করে গ্রামের সব লোক পর্যটকের মুণ্ডুকে কবর দিয়ে সব উপাচারের জিনিস নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আর তারপর ফের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল কাঠ আর পেরেক দিয়ে। সকলে নিশ্চিন্ত না হলেও প্রাথমিক ভয়টা অনেকের কেটে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এটা এসবের শেষ নয়। শুরু। আর তারপর তাই হল যেটার আশঙ্কা আমি করছিলাম।

খাইসান ধীরে ধীরে পজেসড হতে শুরু করে। প্রথম প্রথম নিজের মনেই বিড়বিড় করত, চোখ উলটে অদ্ভুত আওয়াজ করত। আর তারপর শুরু হল তার ভয়ঙ্কর কাজ। আগুনে নিজে থেকে হাত পা পোড়ানো, গ্রামের পোষা কুকুরগুলোকে খুন করে তাদের কাঁচা মাংস খাওয়া। ঠিক এই সবই যখন চলছিল একদিন হঠাৎ করেই গ্রামের বাতাস বিশ্রী চামড়া পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল। আমি বুঝতে পারি পর্যটক সেই রাত্রে পোড়ো গির্জার ভেতরে কিছু এমন উপাচার করেছে যার ফলে অশুভ কিছু এই জগতে চলে এসেছে অন্য জগত

থেকে। ব্যাপারটা তোমরা হয়তো এখনই বুঝতে পারবে না। স্বর্গ নরকের কনসেপ্টে বিশ্বাস করলে এটা বুঝতে পারতে তোমরা। সে পর্যটককে খুন করেছে কিন্তু খাইসানকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে এতটাও ভালো সে নয়। সে খাইসানের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। আর সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। এই পর্যটকটি আসলে কে? আর কেনই বা সে কাঞ্জাংকে এই অশুদ্ধ উপাচারে অভিশপ্ত করে তুলল? এখানকার লোকেদের সাথে কি ওর কোনও পূর্ব শত্রুতা ছিল? আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মাথায় একটা কথা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এল। এই পর্যটকটি সেই মহিলার হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি নয়তো? যে নিজের মা বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে? আমি জনে জনে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ শুনল না। কারণ ওদের মনে সেই পুরনো স্মৃতি ফের জেগে উঠেছিল যে খ্রিস্টান মানেই খারাপ। আমাকে ওরা দূরদূর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলো। আর বলল পরেরদিন সকালের মধ্যেই যেন পাহাড় ছেড়ে চলে যাই। এতদিন এদের মনে খ্রিস্টধর্মের প্রতি যে অল্প অল্প বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করতে পেরেছিলাম, ওদের ছেলে মেয়েকে পড়াতে শুরু করেছিলাম সে সব এই ঘটনায় এক লহমায় ধুলোয় মিশে গেল। আমি ফিরে আসি। আর ওদের জন্য সারারাত বসে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। পরের দিন নিজের যৎসামান্য জিনিস নিয়ে ওদের কাছে ফিরে যাই শেষবারের মতো বিদায় জানাতে। কিন্তু...”

— “কিন্তু পুরো গ্রামে কেউ ছিল না। তাই তো?” এবার পলাশ কথাটা উচ্চারণ করতেই ফাদার ডেংপো মাথা নাড়ালেন।

— “হ্যাঁ। পুরো গ্রাম খাঁ খাঁ করছিল। জানালা দরজা খোলা। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। বিকট চামড়া পোড়া গন্ধ আর গুচ্ছের চুল, নখ ছাড়া সেখানে আর কিছুই পড়ে ছিল না। একটা মানুষও না। আমি আগের দিন ওদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম ওরা কোনও গুণিনকে ডেকে আনবে। নিশ্চয়ই সেই রাতে কিছু অঘটন হয়েছিল। আর যার প্রভাব এখনও সূর্য ডোবার সাথে সাথে পুরো কাঞ্জাঙে টের পাওয়া যায়।”

একটানা পুরো ঘটনাটা বলে কিছুক্ষণ থামলেন ফাদার। তারপর আবার

বললেন, "আমি জানি, পুরো ব্যাপারটা তোমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। তোমরা আধুনিকমনস্ক। ভূতে হয়তো বিশ্বাস করো না। আজকাল তো ঈশ্বরের অস্তিত্বেও অবিশ্বাস তোমাদের। যাকগে... অনেক কথা বললাম। তোমরা চাইলে এখানে কিছুক্ষণ বসতে পারো অথবা নীচে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারো। আমার কিছু কাজ আছে। আমায় বেরোতে হবে।"

— "এই রাতের বেলা, কোথায় যাবেন আপনি? এই না বললেন সূর্য ডুবলে বাইরে বেরলে বিপদ আছে?" পলাশ কথাটা বলে আড়চোখে রণজয়ের দিকে তাকাল। রণজয়ও অবাক।

— "কোনও সিমেট্রি দীর্ঘ তিরিশ বছরের ওপরে বন্ধ থাকলে তাকে শুদ্ধ করতে হয় নির্দিষ্ট উপাচারে। আর সেটা একমাত্র কোনও গির্জার পাদ্রীই করতে পারেন। এই পাহাড়ে পাঁচখানা এরকম সিমেট্রি আছে যেগুলো চল্লিশবছর আগে পাহাড় থেকে যখন খ্রিস্টানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন থেকে বন্ধ। কাঞ্জাঙে আমায় এই জন্যই পাঠানো হয়েছিল। যাতে আমি এই উপাচারের কাজগুলো করতে পারি। এখানের কাজ শেষ হলে আমি অন্য গ্রামের দিকে এগোব। যাইহোক তোমরা থাকো। কথা বলতে বলতে বেশ দেরি হল। আমি বেরলাম এবার। তবে আর যাই করো ভুলেও গির্জার বাইরে বেরিও না। আমি কোনো বিপদ যেভাবে আটকাতে পারব, তোমরা কি পারবে সেভাবে আটকাতে? দু দিন আগে একদল কমবয়সী ছেলে এসেছিল। এখানেই উঠেছিল। আমার বারণ সত্ত্বেও তারা বাইরে বেরিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। তারপর আজও ফেরেনি তারা।" কথাটা বলেই ফাদার ডেংপো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নীচে।

রণজয় আর পলাশ বুঝল ফাদার যাদের কথা শেষে বলে গেলেন তারা মিঃ শিমিকের ছেলে আর তার বন্ধুর দল।

— "উনি যতই বারণ করুন, উনি বেরিয়ে গেলেই আমাদের সেই পোড়ো গির্জায় যেতে হবে। ওখানে না গেলে কাঞ্জাঙে বা সেইদিন ওই গির্জায় ঠিক কী হয়েছিল ওখানে তা আমরা কখনই জানতে পারবো না।"

রণজয় অবাক চোখে তাকাল পলাশের দিকে, "একথা কেন বলছিস? তুই

কি আবার কিছু দেখতে পেলি?” পলাশ এতক্ষণ পরে গোরস্থানে দেখা সেই দৃশ্যটার কথা রণজয়কে জানালো। রণজয় শুনে অবাক।

পলাশ বলে উঠল, “জানি না, এটা নতুন কোনও সুপ্ত শক্তির পূর্বাভাস কিনা। কিন্তু সেদিন ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে বহু মাইল দূরের ঘটনাও দেখতে পেয়েছি। বা আজকে সিমেট্রিতে দাঁড়িয়ে অতীতের ঘটনা দেখতে পেয়েছি। কিছু একটা হচ্ছে আমার সঙ্গে জানিস? কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছি কিছু একটা হচ্ছে।”
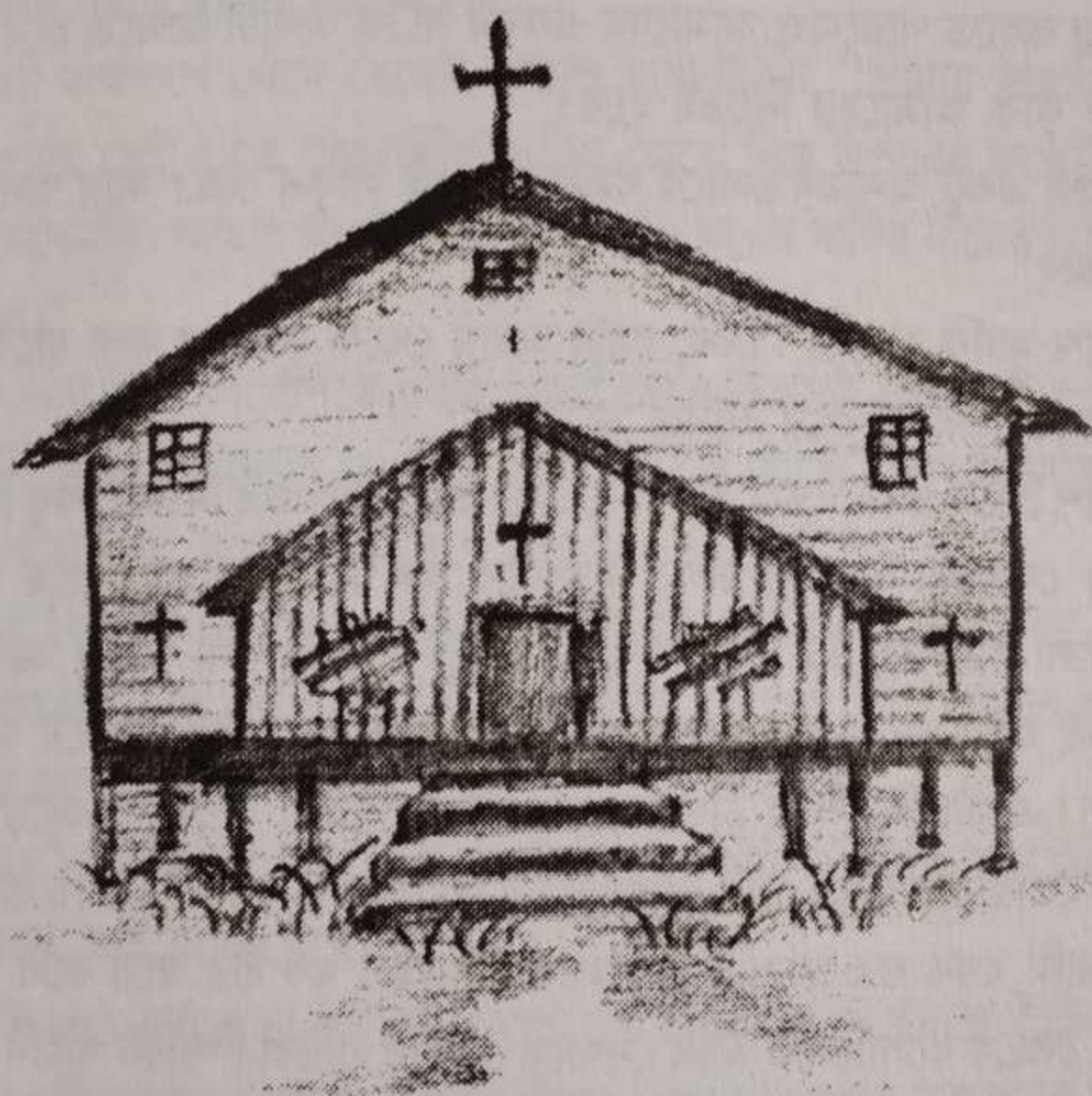
(৬)

।। বিনষ্টপুরীর উপাচার।।

পলাশ ধীরে ধীরে কাঠের বেড়াটা ঠেলে কাঁচা রাস্তার ওপরে নেমে দাঁড়াতেই রণজয় পেছন থেকে বলে উঠল, “ফাদারের কথা না শুনে আমরাও কোনও ভুল করছি না তো? উনি কিন্তু আমাদের বাইরে বেরতে বারণ করেছিলেন।

বলেছিলেন আমাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে।”

— “আমরা এখানে ঘুরতে আসিনি রণ। আমাদের এখানে আসার পিছনে অন্য একটা কারণ আছে। তাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কোনও লাভ হবে না। আসল কারণটা ফাদার তো জানেন না। আর তুই ভুলে যাচ্ছিস, আমাদের হাতে আজকের রাতটুকুই সময় আছে। কালকে ফাদার আমাদের ঠিক চলে যেতে বলবেন কাঞ্জাং ছেড়ে। তার আগে যেমন করে হোক লাকুনের রহস্য আমাদের ভেদ করতেই হবে। ফাদারের কথা শুনে কিছু আন্দাজ করতে পারলেও আমাদের একদম সঠিক তথ্যটা জানতে হবে। তাই এইটুকু ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।”

রণজয় একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, “শুধুই লাকুন তো? আর অন্য কিছু নয় তো?”

পলাশ মুচকি হাসল, “দেখ, সেটা আগে থেকে কীভাবে বলা যাবে? নে চল। আর দেরি না করে আমরা এগোই।”

পলাশ পিঠে একটা ছোট ব্যাগ নিয়েছে। এই ব্যাগে ওর নিজের কিছু জিনিস আছে। যেগুলো ওর ব্যক্তিগত দরকারে লাগে। রণজয়ের কাছে একটা জোরালো আলোর টর্চ ছাড়া হাত মোটামুটি খালিই বলা চলে। আপাতত দু'জনেই কাঁচা এবড়ো খেবড়ো পথ বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে চুপচাপ। একটা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে পার্বত্য উপত্যকা জুড়ে।

— “তোর মনে আছে সেই বোরহান নামের ছেলেটি যখন পজেসড হয়েছিল আর আমি যখন ওর রুমে গিয়েছিলাম।” পলাশ খুব ধীর স্বরে বলে উঠল, “আমি তোকে বলেছিলাম আমি সেখানে কোনও এভিল স্পিরিট পাইনি। কিন্তু ছেলেটি পোজেসড ছিল। এতক্ষণ পরে মাথায় এল, যেই ছেলেটির মধ্যে প্রথম লাকুন আশ্রয় নিয়েছিল...।”

— “খাইসান।”

— “হ্যাঁ, ওই খাইসান আর বোরহান দুই যমজ ভাই। আসল এফেক্টটা খাইসানের হয়েছিল। তুই ভালো করে জানিস টুইনস বা যমজ শুধুমাত্র বাহ্যিক দিক দিয়ে বা আচার আচরণেই এক হয় না, as they are the split part

of same soul একজনের আত্মা অপরজনের সাথে যুক্ত থাকে। তাই খাইসানকে যখন লাকুন ভর করেছে, তখন ওর যমজ ভাই বোরহানের ক্ষেত্রেও সেই আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তার মানে সেদিন বোরহান মারা গিয়েছিল কারণ তাঁর ভাই এখানে মারা গিয়েছিল। আর আমি বোরহানের ঘরে মানসচক্ষে যে দৃশ্যটা দেখেছিলাম সেটা আসলে এই কাঞ্জাঙে হচ্ছিল। খাইসানের সাথে।"

— "তাই যদি হবে তাহলে তুই তো একটি মাটির নীচের ঘরের দৃশ্য দেখেছিলি। কিন্তু ফাদার বলেছিলেন..."

রণজয় মাঝপথে থেমে যেতেই পলাশ বলে উঠল, "ফাদার বলেছিলেন তাঁর সন্দেহ সেই রাতে গ্রামবাসীরা গুণিন ডেকে কিছু উপাচার করেছিল যা তিনি দেখেননি। আমার মনে হয় সেটা কোনও ঘরের মাটির নীচের কুঠুরিতে হয়েছিল।"

ঠিক এমন সময় কাছেপিঠে একটা হায়না ডেকে উঠতেই রণজয় বলে উঠল, "মিঃ শিমিকের কাণ্ডখানা দেখলি? আমাদের কে ফেলে রেখে কোথায় যেন চলে গেলেন। যা করছিলেন দেখে তো মনে হল...।"

পলাশ বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ওনার এইভাবে আমাদের একলা ফেলে চলে যাওয়াটা বেশ রহস্যময়। উনি তো ওনার ছেলের খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন? আচ্ছা, ওনার কোনও বিপদ হল না তো?"

রণজয় মজা করে বলল, "তুই সবেই বিপদ দেখছিস। পাতি কথা উনি ভয় পেয়েছেন, তাই চলে গেছেন।"

কথাটা শেষ করতে না করতেই পলাশ ওর হাতটা চেপে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখের দৃষ্টি সামনের গাঢ় অন্ধকারে নিবন্ধ। তাদের সামনে অন্ধকারে কালো কালো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্জাঙের পরিত্যক্ত বাড়িগুলি। কথা বলতে বলতে ওরা কখন যে কাঞ্জাঙের সীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে খেয়াল করেনি এতক্ষণ। একটা হুলফোটানো তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা মারছে ওদের চোখে মুখে।

— "তুই তৈরি?" পলাশ রণজয়ের মুখের দিকে তাকাল।

দেরি না করে ওরা ঢালু পথ বেয়ে কাঞ্জাঙে প্রবেশ করল। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে কি মেঘ করেছে? পাইনবন না থাকায় এই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার।

তাই অনেকটা আকাশ একসাথে দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার নিস্তব্ধ এই পাহাড়ি পরিবেশে শব্দ বলতে পাহাড়ি শোঁ শোঁ হাওয়া, আর সেই হাওয়ায় উড়তে থাকা রংবেরঙের পতাকার পত পত শব্দ।

কাঞ্জাঙে একটা চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের মাঝ বরাবর। রাস্তার দুইদিকে মুখোমুখি টিন আর কাঠ দিয়ে তৈরি একতলা-দোতালা বাড়ি। রণজয় আর পলাশ একটা একটা করে বাড়ি পেরচ্ছে। রণজয়ের হাতের টর্চের তীব্র আলো ঠিক যেন অন্ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুতের ফলা। জোরালো হাওয়ায় ঘরের খোলা দরজা জানালাগুলোর পাল্লা ঠক্ ঠক্ করে একধরনের বিশ্রী আওয়াজ করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো পলাশ। রণজয় অবাক হয়ে দেখল পলাশ আঙুল তুলে সামনের একটি বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করছে।

— "দেখ তো, ওটা কি আগুনের আলো?"

সামনের রাস্তাটি একটা উঁচু বাড়ির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়িটি অন্যান্য বাড়িগুলো থেকে বেশ বড় আর শেষ প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় একটু তফাতে।

রণ তো প্রথমে কিছু বুঝতেই পারল না। কিচ্ছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর জিনিসটা তার নজরে এল। অন্ধকার পরিবেশে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে বাড়িটির সরু ঘুলঘুলি দিয়ে আগুনের হালকা হলদেটে আভা বেরিয়ে আসছে, খুব মৃদুভাবে।

রণজয় অবাক হয়ে তাকাল পলাশের মুখের দিকে। "সকলে যে বলেছিল কাঞ্জাং জনশূন্য? তাহলে কে আছে ওই বাড়িটার ভেতরে? যে এই রাতের আঁধারে এই শ্মশানপুরীতে আগুন জ্বালিয়ে বসে..."

রণজয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই দপ্ করে আলোটা যেন ঘরের ভেতরে নিভে গেল। সেটা দেখেই পলাশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বলে উঠল, "ওটা বাড়ি নয় রণ। ওটা সেই পোড়ো গির্জা।"

* * * * * * * * * *

আশ্চর্যের কথা, গির্জার দরজাটা কাঠ মেরে আটকানো ছিল না। রণ আর পলাশ দরজার ভারী পাল্লাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে টর্চলাইটের উজ্জ্বল

সাদা আলো ফেলতেই গোটা ঘরের দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটা বিশাল লম্বা কাঠের তৈরি হলঘর। ঘরের দেওয়াল, দরজা জানালা, উঁচু ছাদ ও তার কড়ি বরগা, ঘরের মাঝখানের খুঁটি সব কাঠের তৈরি। কিন্তু চারিদিকে কালো কালো ছোপ, কাঠ পুড়ে যাওয়ার নিদর্শন। এই ঘর জুড়ে যে একসময় সত্যি এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রণজয় দেখল হলঘরের কাঠের ছাদে আর মেঝেতে দীর্ঘ অবহেলায় ঘুণ ধরেছে। কিছু কিছু জায়গা আবার ভেঙেও গিয়েছে। জানালাগুলো সত্যি সত্যি ভেতর থেকে কাঠের পাটা আটকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা হলঘরে কেউ কোথাও নেই।

হলঘর বরাবর কিছুটা এগিয়েছে আর ঠিক তখনই কী একটা জিনিস দেখতে পেয়ে রণজয় আচমকা চিৎকার করে উঠল, "কে? কে ওখানে?" পলাশ অবাক হয়ে দেখল রণজয় হাতের টর্চ লাইটের আলোটা মাথার ওপরের কড়ি বরগায় ইতস্ততভাবে ঘোরাচ্ছে।

— "কিরে? কী হল?"

— "আমার মনে হল আমি কাউকে নড়তে দেখলাম অন্ধকারে।"

কিন্তু নাহ। সেখানে কেউ ছিল না। ওরা ধীরে ধীরে হলঘরের অপরপ্রান্তে এসে পৌঁছল। আর ঠিক তখনই গির্জার মেঝেতে পড়ে থাকা কিছু জিনিস দেখে ওরা বেশ অবাক হল।

শুকনো পোড়া কাঠের মেঝের ওপরে আটা জাতীয় কিছু দিয়ে একটা বড় নক্সা আঁকা। সেই নক্সা দেখে একটা অজানা শিরশিরে অনুভূতি বয়ে গেল পলাশের মেরুদণ্ড দিয়ে। এ নক্সা তার বড়ই চেনা। এই নক্সারই একটা প্রতিরূপ কালশিটের আকারে তার বামহাতের কব্জির ওপরে রয়েছে। একটা বৃত্ত আর বৃত্তের চারদিকে চারটি অসম অর্ধবৃত্ত। সেই নক্সা ছাড়াও মেঝের ওপরে আরও কিছু জিনিস এলোমেলো অবস্থায় পড়ে ছিল।

যেমন, কিছু শুকনো পাতা, কিছু মাটির সরা জাতীয় পাত্র, একটা পুরনো জং ধরা ছুরি, কিছু কাঠের ছোট ছোট ক্রুশ, ছেঁড়া খবরের কাগজের ওপরে রাখা আলপিন, একটা পুরনো হাতুড়ি, একটা পুরনো আলকাতরার বালতি আর

একটা ব্রাশ, আর সবচেয়ে আবাক করা কিছু আধপোড়া মোমবাতি যার বাতি থেকে তখনও হালকা ধোঁয়া বেরচ্ছিল। বোঝা গেল মোমবাতিটা একটু আগেই নেভানো হয়েছে।

ঠিক এমন সময় রণজয়ের চোখে কী একটা পড়তে রণজয় চমকে জিনিসটা তুলে ধরল একহাতে। একটা রক্তমাখা মরচে ধরা শিকলের টুকরো যার শেষ প্রান্ত একটা কাঠের খুঁটির গোড়ায় বাঁধা ছিল।

পলাশের কপালের ভাঁজ গাঢ় হল সেই শিকলটা দেখে। এই শিকলে কেউ বাঁধা ছিল একটু আগেও। রণজয় বিড়বিড় করে বলে উঠল, "আমাদের সাবাধানে থাকতে হবে পলাশ। যে ছিল সে আমাদের দেখেই শিকল খুলে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।"

* * * * * * * * * * *

ঘরের পোড়া মেঝেতে আঁকা সেই নক্সার মাঝখানে পদ্মাসনে বসে আছে পলাশ। নক্সার চারিদিকে আধপোড়া মোমবাতিগুলো ফের জ্বালানো হয়েছে। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা হলদেটে আলোয় পুরো হলঘর জুড়ে এক আলো আঁধারি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। খালি গায়ে ডানহাতে প্যাঁচানো রুদ্রাক্ষের মালা প্রকট হয়ে উঠেছে সেই আলোয়। চোখের দৃষ্টি আনত আর সামনের দেওয়ালে রাখা বিরাট আধপোড়া কাঠের ক্রুশের ওপরে নিবদ্ধ। রণজয় আলকাতরা মাখানো শেষ ক্রুশটিকে সোজা ভাবে স্থাপন করে সরে আসতেই দেখা গেল, সেই দেওয়াল জুড়ে বড় ক্রুশের চারিদিকে অবস্থান করছে গোটা পনেরো কাঠের ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির ক্রুশ।

একটু আগেই ওরা খেয়াল করেছে কেউ যেন সামনের দেওয়াল জুড়ে কাঠের ছোট ছোট ক্রুশগুলোকে আলকাতরা মাখিয়ে উলটো করে পেরেক ঠুকে দেওয়ালের সাথে আটকে রেখেছিল। ওরা আর কিছু বুঝুক না বুঝুক এটুকু বুঝেছিল ওলটানো ক্রুশ ভয়ঙ্কর অমঙ্গল বহন করে। আর এই রকম অমঙ্গল স্থানে ওদের ক্ষমতা কিছুতেই কাজ করবে না। তাই তড়িঘড়ি রণজয় সবকটা ক্রুশকে ফের সোজা ভাবে বসিয়ে দিলো পেরেক ঠুকে। এবার যা

করতে হবে পলাশকে করতে হবে।

পলাশ বোধহয় এই সময়ের অপেক্ষাই করছিল। রণজয় তার থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরে যেতেই পলাশ খুব শান্তভাবে চোখ বন্ধ করে ইষ্টকে স্মরণ করে শুরু করল মন্ত্রপাঠ। গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের বাতাসে। পলাশের মন্ত্রপাঠের তালে তাল রেখে ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে মোমবাতির আলো। সেই আলোয় চকচক করে উঠল পলাশের সুঠাম শরীর।

পলাশকে পাহারা দিতে হবে। ধ্যানে বসলে কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত পলাশ অশুভ শক্তির সহজ টার্গেট। আর সে কোনভাবেই তা হতে দেবে না। লাকুনেরা অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির নরকজীব। তারা পলাশকে কিছুতেই এই রহস্যের গভীরে পৌঁছতে দেবে না। যতই হাতের উল্কিটা জ্বালা করুক না কেন যে কোনো অপশক্তিকে পলাশের কাছে ঘেঁষার আগে তার মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু কেন কিছু অঙ্ক এখনো মিলছে না? পুরোটাই তো জেনে গিয়েছে তারা? কিন্তু তবুও কোথাও যেন একটা সুতো ছাড়া হয়ে রয়েছে। যা কিছুতেই তাদের নজরে পড়ছে না।

ওদিকে ধীরে ধীরে পলাশের মুখ নিঃসৃত মন্ত্রপাঠের গতি বাড়তে শুরু করেছে। পলাশ টের পাচ্ছে হঠাৎ তার শরীরটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে উঠছে। ডানহাতের প্যাঁচানো রুদ্রাক্ষের মালার ভেতরের উল্কির জায়গাটা জ্বালা করে উঠছে তার অজান্তেই। ওটা জেগে উঠছে। হ্যাঁ! তার হাতের উল্কিটা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে।

সে মন্ত্র পাঠ থামাল না। বরং চোখবন্ধ অবস্থাতেই ধীরে অতি ধীরে বাম হাত দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালার এক একটা প্যাঁচ খুলতে লাগল। যত খুলতে লাগল সেই প্যাঁচ ততই ক্ষীণ হতে লাগল তাকে ঘিরে থাকা মোমবাতির হলুদ আলো। দেখতে দেখতে একসময় দপ করে নিভে গেল সবকটা মোমবাতির হলুদ আলো। কিন্তু সেও মাত্র এক মুহূর্তের জন্য।

আর সাথে সাথেই যা হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। পলাশের রুদ্রাক্ষের মালার প্যাঁচ খোলার সাথে সাথে এক অপার্থিব সবুজ আলো বের হতে লাগল হাতের উল্কিটা থেকে। ওই তো! ওই তো দেখা যাচ্ছে তার জীবন্ত নাগউল্কি।

দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল জীবন্ত কোনো সাপ পলাশের কব্জির ওপর নড়াচড়া করছে। পলাশ ধীরে ধীরে দুই হাতের মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালাটা ধরে প্রণামের মুদ্রা করতেই উল্কির সাপটা কব্জি ছাড়িয়ে কনুই বেয়ে ধীরে ধীরে কাঁধের দিকে উঠতে লাগল। পলাশের মন্ত্রের ভাষা অভিন্ন। কিন্তু পালটে গিয়েছে ওর মন্ত্র পাঠের সুর। রণজয় দেখল পলাশের সারা শরীর থেকে এক অপার্থিব সবুজ আভা বের হচ্ছে। আর ওর হাতের নাগ উল্কিটা জীবন্ত হয়ে কাঁধ বেয়ে উঠে এসে সারা পিঠে চরে বেড়াচ্ছে। তারপর ঠিক পলাশের কোমরের মাঝামাঝি মেরুদণ্ডের উপর হঠাৎ উল্কিটা মিলিয়ে যেতেই আরেক আশ্চর্যের ব্যাপার হল। পলাশের নাভির কাছে ঘন মেঘের মতো নীল রঙের উজ্জ্বল আলো দিয়ে গড়া একটি পদ্ম উঠল আকস্মিকভাবে। কী অপূর্ব এক নীলাভ জ্যোতি বিকিরণ করছে সেই পদ্ম!

পলাশের নিজস্ব নাগশক্তি ও সুরেলা মন্ত্রজপের শক্তি একত্রিত হয়ে তার শরীরের মণিপুর পদ্মে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলছে ধীরে ধীরে। রণজয় জানে, পলাশ ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদিতে দক্ষ না হলেও সে সঙ্গীতজ্ঞ, আর সুর কুণ্ডলিনী জাগরণের সহায়ক।

রণজয় স্পষ্ট দেখল, ওই নীলাভ পদ্ম থেকে একটি অতি সূক্ষ্ম সর্পাকৃতি জ্যোতিঃপুঞ্জ আস্তে আস্তে উপরে উঠছে, সেই সঙ্গে ম্লান হয়ে আসছে সেই নীলপদ্ম। ওই আলো দিয়ে গড়া সর্প পলাশের মেরুদণ্ড বরাবর ওপরে উঠে তার বুকের মাঝবরাবর পৌঁছতেই সেখানে বন্ধুক ফুলের মতো রক্তাভ বর্ণের একটি পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম, যে পদ্মে সাধক নিজ ইষ্টমূর্তির ধ্যান করেন, সেই পদ্মই ফুটে উঠছে। এক স্নিগ্ধ রক্তাভ দ্যুতিতে ভরে উঠছে সারা ঘর! কী অভাবনীয় দৃশ্য!

এইসব ভাবছিল রণজয়, ঠিক এমন সময় ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। পলাশের সারা দেহ থেকে বিচ্ছুরিত সেই আলো সামনের দেওয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। আচমকা সেই আলোয় দেখা গেল, রণজয়ের এত কষ্ট করে সঠিক অবস্থানে ফেরানো কাঠের ছোট ছোট ক্রুশগুলো আগের মতোই উলটে যাচ্ছে আপনা থেকেই। একী! এ যে ভয়ঙ্কর অশুভ ইঙ্গিত! তার মানে কী...

ঠিক এমন সময় মন্ত্রপাঠ থেমে গিয়ে এক অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল পলাশের গলার ভেতর থেকে। সেই সাথে অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার নগ্ন পিঠ। তাহলে! তাহলে কি পলাশ কিছু দেখতে পাচ্ছে?

চমকে উঠে রণজয় যেই এগোতে যাবে পলাশের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে কানের ঠিক পিছনে খিলখিল করে বুকের রক্ত জল করা হাসিতে হেসে উঠল কেউ।

রণজয় চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। রণজয়ের নাক উঁচিয়ে বাতাসে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করল। নাহ, কোনো পোড়া গন্ধ সে পেল না। তার চোয়াল শক্ত হল। মানে এটা কোনও লাকুন নয়। এ অন্য কিছু। কিন্তু কী?

আবার সেই খিলখিলে হাসির শব্দ কানের বাঁদিকে। শত শত হায়নাকেও হার মানাবে সেই হাসির ক্রূরতা। কিন্তু একী? সেই হাসি এক জায়গায় থেমে নেই। রণজয়ের ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সেই হাসির শব্দ ব্যপ্ত হচ্ছে।

অন্ধকার ঘরের চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই হাসির শব্দ। সেই সঙ্গে খোনা গলায় ভেসে আসছে কিছু টুকরো শব্দ।

— "আমায় ধরতে চাস? আমায় ধরবি?... পারবি? হিঃ হিঃ!"

রণজয় একমুহূর্ত দেরি না করে জ্যাকেটের হাতাটা গুটিয়ে নিতেই দেখা গেল, ডানহাতে প্যাঁচানো রুদ্রাক্ষের ফাঁক থেকে নির্গত হচ্ছে এক অদ্ভুত নীল আলো।

এ এক ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী পিশাচিনী তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মেঘনাদের মতো অন্ধকারে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে। খেলাচ্ছে রণজয়কে। ভয় পাওয়াচ্ছে তাকে। এই খেলা সমূলে বিনাশ করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রণজয় গুরুমন্ত্র জপ করে ইষ্টকে স্মরণ করতেই দপ করে দুই হাতে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল নীল আগুনের আভা। উফ কী শীতল! কী উজ্জ্বল সেই নীল আগুনের তাত। কিন্তু ও কী? এ কাকে দেখছে সে?

এক ভয়ঙ্কর বিকট দর্শন নগ্ন নারীমূর্তি ঠিক তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মুখটা কী অসম্ভব লম্বাটে তার, থুতনি যেন বুকের কাছে ঝুলছে, সারা মুখে একটি বিশেষ নক্সার দগদগে ঘা। কেউ যেন বিশেষ নক্সাওলা একটা জ্বলন্ত শলাকা প্রতিনয়ত চেপে ধরে তার মুখে। বলাই বাহুল্য এই সেই নক্সা যার মাঝে

এই মুহূর্তে পলাশ ধ্যানে বসেছে। পচে যাওয়া মাড়ি থেকে পুঁজ ঝরছে, দাঁতের ফাঁক থেকে পচা মাংসের টুকরো, চোখের দৃষ্টি বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে। শিরা বেরোনো হাতগুলো শীর্ণ আর কী অসম্ভব লম্বা। এত সামনে এই ভয়ঙ্কর মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠল রণজয়।

কিন্তু রণজয় কিছু করবার আগেই সেই পিশাচিনী নিজের সরু অথচ সাঁড়াশির মতো শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরল রণজয়ের গলা। একী! এ কী করে সম্ভব! কোনো অশরীরী অপশক্তি বীজমন্ত্র উচ্চারণ কালে কীভাবে ছুঁতে পারে রণজয়কে? সে যে স্বর্গদ্বার রক্ষী!

কিন্তু না। সেই পিশাচিনীর কিচ্ছু হচ্ছে না। বরং সময় যত যাচ্ছে ওর শক্ত আঙুলগুলো আরও চেপে বসছে রণজয়ের গলায়। সেই সাথে সমস্ত শরীর জুড়ে বাড়ছে অসম্ভব জ্বালা। রণজয় বুঝতে পারছে তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। হাত দিয়ে যে পিশাচিনীর আঙুলগুলো ছাড়াবে সেই ক্ষমতাও যেন তার বিলুপ্ত হয়েছে।

পিশাচিনী খিলখিলে হাসি হেসে উঠল আবার। একটা বিকট মাংসপচা বমন উদ্রেককারী গন্ধ ধাক্কা মারছে রণজয়ের নাকে। সে বলে উঠল, "কী ভেবেছিলি... এই করে আমাকে আটকাবি? পারবি? আমি যে ভূত নই, পেত্নী নই, অশরীরী নই। আমি তো মানুষ... হি হি হি হি! আমি যে মানুষ... হি হি হি হি!" আবার সেই রক্ত জল করা হাসি। "আমি যে ফ্রুই সাতানাস! আমাকে যে আটকানো যায় না..."

মাথায় অক্সিজেনের ওভাবে ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে রণজয়ের চোখে। ও কী তাহলে এইভাবেই মারা পড়বে? এই পোড়ো গির্জায়?

সেই বিকটদর্শন নারীটি বলে উঠল, "আগে তোকে মারব। তারপর তোর বন্ধুকে। কীভাবে আটকাবি আমায়... হি হি হি হি। কিন্তু আমায় আটকাতে পারতিস যদি বাইবেল পড়তিস। যদি সব উপাচার জানতিস... কিন্তু তুই জানিস না। জানিস না...।" ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে লাগল রণজয়ের কানে।

সে বোধহয় মারাই পড়বে। পলাশকেও সে বাঁচাতে পারবে না এই ভয়ঙ্কর পিশাচিনীর কবল থেকে। প্রায় যখন দু'চোখে অন্ধকার দেখছে রণজয় ঠিক

তখনই জিনিসটা হল যার জন্য সে একেবারেই আশা করেনি। বজ্রনাদ হল যেন গির্জার প্রধান দরজার মুখে, — "ওকে ছেড়ে দে।"

রণজয়কে এক হাতে তুলে পেছন ঘুরল সেই ভয়ঙ্করী। এক হাতে মশাল জ্বালিয়ে দরজার গোড়ায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে রণজয় চিনতে পেরেছে। মিঃ শিমিক! সারা শরীরে মুখে রক্তাক্ত ক্ষত। পোশাক ছেঁড়া। কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ। একহাতে জ্বলন্ত মশাল তাঁর। অন্য হাতে কিছু ধরা। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

— "ভালো চাস তো ছেড়ে দে ওকে।" মিঃ শিমিক গম্ভীর কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো বলে উঠতেই সেই পিশাচিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল প্রথমে, তারপরে প্রবল আক্রোশে গর্জন করে উঠল, "তুই... তুই ভয় দেখাস আমায়? এত সাহস!" বলেই রণজয়কে মেঝেতে আছাড় মেরে সে ছুটে গেল দরজার মুখে। কিন্তু মাঝপথেই থমকে যেতে হল তাকে। কারণ ততক্ষণে মিঃ শিমিক অন্যহাতে ধরা পকেট বাইবেলটা মশালের আলোয় পড়তে শুরু করে দিয়েছে চিৎকার করে," Hail Mary– full of grace– the Lord is with thee. Blessed art thou among women– and blessed is the fruit of thy womb– Jesus. Holy Mary– Mother of God–

সেই বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর থেকে নির্গত প্রত্যেকটা শব্দ শুনে কী যেন একটা হল সেই ভয়ঙ্করী মানবীর। দুই কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন মিঃ শিমিক, pray for us sinners– now and in the hour of our death. Amen.

বোঝা যায় বাইবেলের শব্দবন্ধ শুনে তার কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। একটা উষ্ণ হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে পুরো গির্জা জুড়ে। একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি যেন পাক খাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের মতো, কিন্তু বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। ওদিকে কাঠের মেঝের ওপরে পরে রণজয়ের চোখে ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসছে। একটা সময় পর সে আর কিছুই দেখতে পেল না। জ্ঞান হারিয়ে গির্জার কাঠের মেঝের ওপরে পড়ে রইল।

(৭)

।। শয়তানের জীবন্তভোগ।।
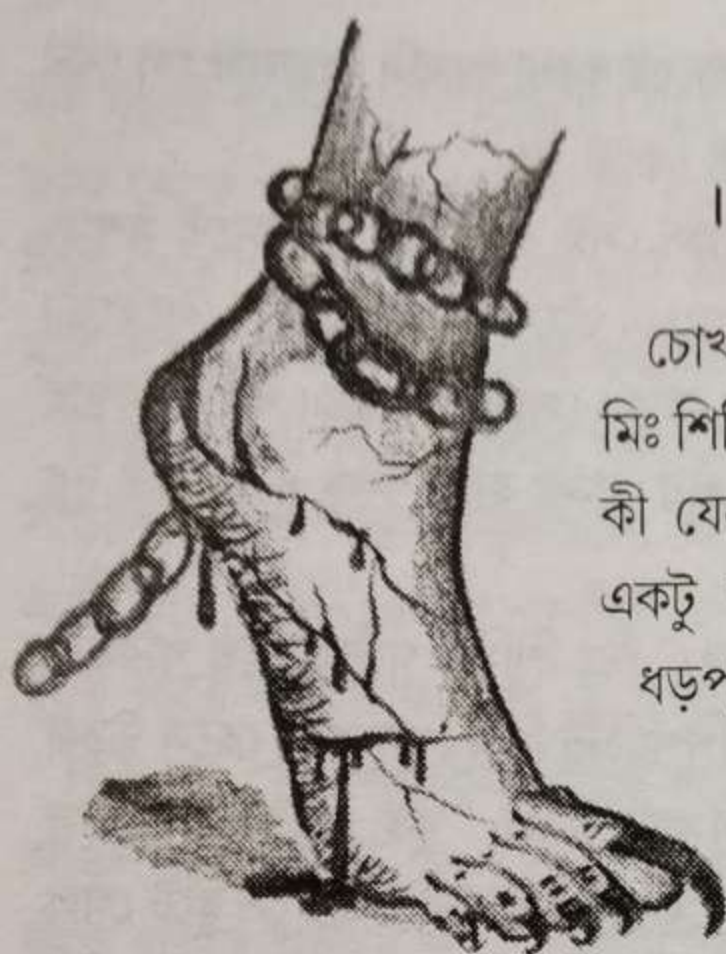
চোখ মেলতেই রণজয় দেখল পলাশ আর মিঃ শিমিক উদ্বিগ্ন মুখে তার মুখের ওপরে ঝুঁকে কী যেন দেখছেন। প্রাথমিক ধোঁয়াশা কেটে একটু আগের কথা মনে পড়তেই রণজয় ধড়পড় করে মেঝের ওপরে উঠে বসল। আর বসতেই তার মালুম হল গলার নলিটা ব্যথা করছে। ওই ভয়ঙ্করী তার গলা খুব জোরে টিপে ধরেছিল।

— "ওই জিনিসটা কি মারা পড়েছে?" রণজয় মিঃ শিমিকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করতেই উনি মাথা নাড়ালেন, তারপর পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলে উঠলেন, "নাহ! বাইবেলের আভে মারিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অংশ, যেখানে জাগতিক যা কিছু কলুষতা মাতা মেরির চরণে উৎসর্গ করা হয়। তাঁর মাতৃশক্তি, পবিত্রতা, আর বিশুদ্ধতা সকল খারাপ কিছুকে প্রতিহত করে। ওই ভয়ঙ্কর মানবী সেই মন্ত্র শুনেই মূর্ছা যায়। আমি তোমার অবস্থা দেখে খানিকটা ভয়ই পেয়েছিলাম। ছুটে তোমার অচেতন দেহের কাছে এসে দেখি তোমার শ্বাস চলছে। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে যেই পিছন ঘুরেছি, চমকে দেখি মেঝে ফাঁকা। সেই ভয়ঙ্করী পালিয়েছে। আমার কাছে মিথ্যে মূর্ছা যাওয়ার নাটক করছিল।"

— "কিন্তু, আমার শক্তি ওর কাছে কাজ করছিল না কেন?" রণজয় অবাক হয়ে পলাশের দিকে তাকাল। পলাশও এটা শুনে অবাক হল।

মিঃ শিমিক এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তারপর বলে উঠলেন, "আমার মনে হয় তোমার বা তোমাদের ক্ষমতার এখনও পূর্ণ বিকাশ হয়নি। কিংবা এটাও হতে পারে তোমাদের যা কিছু ক্ষমতা তা কেবল তাদের ওপরেই কাজ করে যারা এই জগতের অন্তর্গত নয়। মানে, ভূত, প্রেত, অশরীরী, ডাইনী, পিশাচ, যে কোনো নরকজীব, শয়তান, পরপার থেকে আসা কোনো সুপার ন্যাচারাল

পাওয়ার। জীবিত মানুষের ওপর সম্ভবত এটা কাজ করে না।”

— “আপনি বলছেন ওটা জীবিত মানুষ?” আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রণজয়ের মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্করীর একটি কথা, “আমি যে ফ্রুই সাতানাস! আমাকে যে আটকানো যায় না...”

— “ওই মেয়েটি নিজেকে বলেছিল Frui satanas.” রণজয় তাকাল মিঃ শিমিকের দিকে, “এ কথার মানে কী?”

— “Frui satanas এই লাতিন শব্দের মানে তো ‘শয়তানের ভোগ!’ কিন্তু কোনো জীবিত মানুষ?” মিঃ শিমিক কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলেন মনে মনে। তারপর দু-একবার বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে উঠলেন, “শয়তানের ভোগ!... শয়তানের ভোগ!...”

তারপর রণজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “নাহ, এটা ঠিক কী সেটা একটু জানতে হবে...”

— “আমি বলছি।” এতক্ষণ পরে শান্ত সমাহিত পলাশের কণ্ঠস্বর গির্জার ভেতরে গমগম করে উঠল, “তার আগে বলুন, এসব আপনি কী করে জানলেন? এই বাইবেল, আভে মারিয়ার ক্ষমতা, রণজয়ের শক্তি কাজ না করার কারণ এসব কিছু একজন সাধারণ কারও পক্ষে তো জানার কথা নয়? আর আপনি এত ভালো বাংলা যখন বলেন তাহলে প্রথমে হিন্দিতে কেন কথা বলছিলেন?”

মোমবাতির হলুদ আলো মিঃ শিমিকের মুখের ওপরে পড়ছিল। ঈষৎ অস্বস্তি দেখা গেল কি সেই মুখে? মিঃ শিমিক বলে উঠলেন, “প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি তোমাদের মিথ্যে বলেছিলাম। আমি একজন খ্রিস্টান ডেমনোলজিস্ট। নিবাস কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটে। আমার নাম অভ্রদীপ দত্ত।”

রণজয় অবাক, “আপনিই বিখ্যাত ভূতবিশেষজ্ঞ অভ্রদীপ ডেভিড দত্ত? আপনার লেখা বই বেশ কয়েকটা আমি পড়েছি।”

পলাশ নিজে ভদ্রলোকের নাম বহুবার শুনেছে রণজয়ের মুখে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর প্রখ্যাত ডেমনোলজিস্ট। বিদেশের বিভিন্ন নামী পত্র-পত্রিকায় ভদ্রলোকের বিভিন্ন আর্টিকেল বেরিয়েছে আর বিভিন্ন মহলে তা প্রশংসিতও

হয়েছে। কিন্তু উনি এখানে কী করছেন?

— "আমাদের অনেক সোর্স থাকে আর তাদের থেকেই বিভিন্ন জায়গার খবর পাই আমরা। আমি গত পরশু রাতে এরকমই এক সোর্স থেকে খবর পেলাম কাঞ্জাঙের ব্যাপারে। একটা গোটা জায়গা কীভাবে অশুদ্ধ হতে পারে বুঝতে পারিনি। কিন্তু বুঝতে পারি এক ভয়ঙ্কর কিছু হচ্ছে এখানে। একমুহূর্ত দেরি না করে নিজেই ড্রাইভ করে বেরিয়ে পড়ি রাতে। আমি খবর পেয়েছিলাম এদিককার কোনো ড্রাইভার কাঞ্জাঙে যাচ্ছে না তাই গাড়ির রিস্ক নিইনি। যখন মিরিকে বসে লাঞ্চ করছি তখন দেখতে পাই তোমরা মরিয়া হয়ে গাড়ির সন্ধান করছ। ঠিক কী কারণে তোমরা কাঞ্জাং আসতে চাইছ সেটা না জেনে আমি তোমাদের নিজের আসল পরিচয় দিতে চাইনি। কারণ তোমরা নিজেদের যে পরিচয় দিয়েছিলে সেটা আমার বিশ্বাস হয়নি। তাছাড়াও, একজন ডেমনোলজিস্ট চাইলেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না। তাই নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। যদিও সবটা মিথ্যে ছিল না। সেইদিন সকালেই মিরিকে পৌঁছে জানতে পারি একদল ছেলে কিছুদিন আগে কাঞ্জাঙে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। নিজেকে সেই গল্পের অংশ করেই তোমাদের কাছে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম। সম্ভবত আমার চেহারার জন্য তোমরা আমায় বিশ্বাসও করেছিলে।"

রণজয় বলল, "হ্যাঁ, ইতিপূর্বে আপনার কোনো ছবি আমরা দেখিনি। আর আপনাকে গড়পড়তা বাঙালির মতো..."

— "আমার বাবা ছিলেন বাঙ্গালী খ্রিস্টান, আর আমার মা ছিলেন একজন নেপালি হিন্দু। মায়ের তরফ থেকে পাওয়া মোঙ্গলীয় ছাপ আমার মুখে স্পষ্ট। অনেকে আমায় সেই জন্য নেপালি বা ভুটানি ভেবেও ভুল করেন। তুমি এখন ঠিক আছো?" শেষের কথাটা রণজয়কে লক্ষ্য করে বললেন।

রণজয় স্মিত হেসে মাথা নাড়াল। গলাটা বেশ ব্যথা করছে কিন্তু সে কথা জানালে পলাশের অযথা চিন্তা বাড়বে।

— "কিন্তু আপনি আমাদের ফেলে কোথায় গিয়েছিলেন?" পলাশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো মিঃ দত্তর দিকে, "আর আপনার এই রকম ক্ষতবিক্ষত অবস্থা হল কী করে?"

— "হ্যাঁ, আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি ফিরে গিয়েছেন মিরিকে।" রণজয় বিড়বিড় করে বলে উঠল।

মিঃ দত্ত বললেন নিজের কাহিনী, "তোমরা যখন পরিত্যক্ত সিমেট্রির দিকে এগোচ্ছিলে ঠিক তখনই মনে পড়ল আমার কিটব্যাগটা তাড়াহুড়োতে গাড়ির মধ্যেই ফেলে এসেছি। ওর মধ্যে আমার কিছু দরকারী জিনিস যেমন বাইবেল আমার ডায়েরি, রুপোর ছোট ক্রুশ, হোলি-ওয়াটার এইসব টুকটাক জিনিস-পত্র ছিল যেগুলো এইরকম অভিশপ্ত জায়গায় ভীষণ দরকারি। আমি ভেবেছিলাম তোমাদের কবরখানা দেখে ফিরতে ফিরতে আমি ব্যাগটা নিয়ে চলে আসব। কিন্তু ব্যাগটা নিয়ে ফিরতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার পথ আগলে দাঁড়ায় এক ভয়ঙ্কর অশরীরী। আমি যা শুনেছিলাম আমার মনে হয়েছিল কাঞ্জাঙে সূর্য ডোবার সাথে সাথেই অশরীরীদের তাণ্ডব বাড়ে, কিন্তু কোন ধরনের অশরীরী তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু যাকে দেখলাম আচমকা একটা অদ্ভুত ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল যেন। দেখলাম পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে..."

— "একজন লাকুন?" মিঃ দত্তর কথা কেড়ে নিয়ে পলাশ শব্দটা উচ্চারণ করতেই মিঃ দত্ত অবাক হয়ে বললেন, "ঠিক, সেখানে একজন লাকুন পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কালো আধপোড়া শরীর পিঠে একজোড়া আধপোড়া ডানা নাড়িয়ে শূন্যে ভাসছিল। আমি ইতিপূর্বে বহু নরক জীবের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু লাকুনের মুখোমুখি কখনও হয়নি। একজন ডেমনোলজিস্টকে বহুবার এই ধরনের জীবেদের মুখোমুখি হতেই হয়। কিন্তু এত কাছ থেকে এই ভয়ঙ্কর নরকজীবকে দেখে মাথার ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।"

— "তারপর কী হল?"

পলাশের প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে মিঃ দত্ত বলে উঠলেন, "এক বিকট চামড়া পোড়া গন্ধে ভরে উঠেছিল আমার চতুর্দিক। ঘন পাইনবনের অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই রাস্তায় আমার হাতের জ্বলতে থাকা টর্চ লাইটটা নিভে যায় হঠাৎ করে। স্বভাবতই আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি কয়েক মুহূর্ত। মাথা কাজ করছিল না তেমন

করে কিন্তু আমি জানতাম আমায় যদি একবার এই লাকুন স্পর্শ করে তাহলে আমার আত্মাকে ও গ্রাস করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মাথায় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো একটা কথা ধাক্কা মারে। ব্যাগের মধ্যে পবিত্র জলের শিশিটা ছিল। সাথে সাথে অন্ধকারেই ব্যাগ হাতড়ে বোতলটা প্রায় উজাড় করে ঢেলে নিলাম নিজের গায়ে। তারপর মুখস্থ রাখা আভে মারিয়া চিৎকার করে আওড়াতে লাগলাম।

অন্ধকারেই বুঝলাম হাজার হাজার অশরীরী অতৃপ্ত নরকজীব আমাকে ছোঁয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিফল মনোরথে, প্রবল আক্রোশে গর্জন করছিল। মুখ থেকে নিঃসৃত মাতা মেরির উদ্দেশে মন্ত্র, আর বুকে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আমি অন্ধকারেই ঢাল বেয়ে ওপরের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। পিছনে তখনও কানে আসছিল হাজার হাজার ক্রুদ্ধ লাকুনের হুঙ্কার। বুঝতে পারলাম ওরা ধাওয়া করছে। আমায় পালাতে হবে। যে করেই হোক জায়গাটা ছেড়ে অনেক, অনেক দূরে পালাতে হবে। অন্ধকারে, পাইন গাছের শক্ত ডাল লেগে জামা ছিঁড়ে গেল, চোট পেলাম, হোঁচট খেয়ে পড়ে হাত পা ছড়ে গেল। কিন্তু না চলা থামালাম আর না মন্ত্রপাঠ। যখন ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে অন্ধকারে ছুটে চলছি দিকবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে, ঠিক সেই সময় একটা সাদা আলো চোখে এসে পড়ল। ওপরের পাহাড় থেকে দেখলাম দুটো ছায়া শরীর টর্চ নিয়ে নীচের গ্রামের একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকছে। আন্দাজে বুঝলাম ওটা তোমরাই ছিলে। আর দেখো সঠিক সময়ে পৌঁছে দেখলাম সত্যিই ওটা তোমরাই ছিলে।"

— "ভাগ্যিস আপনি সঠিক সময়ে এসেছিলেন নইলে ওই মহিলাকে কীভাবে প্রতিহত করতাম কে জানে। এক সময় তো মনে হয়েছিল আমি মারাই যাবো।"

— "কিন্তু তোমরা ওই গির্জা ছেড়ে এত রাত্রে এই গ্রামে এলে কেন? আর এলেই যখন তখন এই পোড়ো গির্জায় ঢুকতে গেলে কেন?" মিঃ দত্ত অবাক হয়ে তাকালেন ওদের দু'জনের দিকে। রণজয় একবার পলাশের দিকে তাকাল।

পলাশ বলে উঠল, "আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আমরা কারা। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমাদের দু'জনের শক্তির এখনও পূর্ণ বিকাশ হয়নি কারণ আমাদের বয়স কম। আমাদের গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা বলতে পারেন অসম্পূর্ণ।

কিন্তু এই ক্ষমতায় ভর করেই আমরা কলকাতা থেকে এতদূর এসেছি। এই ক্ষমতার গুণেই আমরা জানতে পারি এই সবের পিছনে নরকজীব লাকুনের হাত আছে। কিন্তু এমনি এমনি লাকুন বেরিয়ে আসতে পারে না সেটুকু আমরা জানতাম। ওইপার থেকে এপারে আসতে গেলে ওদের কোনো এক মিডিয়ামের দরকার পড়ে, কোনো চুক্তির দরকার পড়ে, উপাচারের দরকার পড়ে। আর সেই সব রহস্য ভেদ করে নরকের খোলা দ্বার বন্ধ করে লাকুনদের ফেরত পাঠানোর জন্যই আমাদের এখানে আসা।"

একটানা পলাশ কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত থামল, তারপর পরপর সিমেট্রিতে দেখা দৃশ্য, গির্জার ঘটনা, পাদ্রীর মুখ থেকে শোনা কাহিনী, তারপর এখানে আসার সিদ্ধান্ত কী কারণে নেওয়া সব এক এক করে জানালো। সব কথা শেষ হতেই মিঃ দত্ত অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

— "তা, তুমি কী জানতে পারলে এখানে কী উপাচার করা হয়েছিল? কী ধরনের স্যাটানিক রিচুয়াল করে ওদেরকে ডেকে আনা হয়েছিল?" মিঃ দত্তের চোখে চিন্তা মিশ্রিত কৌতূহল, "তুমি আমায় বলতে পারলে আমি কিন্তু তোমাদের সাহায্য করতে পারি। ডেমনোলজিস্ট হিসেবে আমায় কিন্তু এসব নিয়েই পড়াশুনা করতে হয়েছে।"

পলাশ একবার রণজয়ের দিকে তাকাল। রণজয় বুঝল পলাশ কিছু একটা ভাবছে। আচ্ছা সে কি মিঃ দত্তকে বিশ্বাস করতে পারছে না? নাহ! তাই যদি হবে তাহলে পুরো ঘটনাটা সে মিঃ দত্তকে বিস্তারিতভাবে বলল কেন?

— "চলুন বাইরে যাওয়া যাক। তুই হাঁটতে পারবি তো?" পলাশ উঠে দাঁড়াতেই রণজয় অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। পলাশ কি কিছু দেখতে পায়নি তাহলে? তাই যদি না হবে সে উপাচার খণ্ডন না করে গির্জা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে কেন? এটুকু তো পলাশ নিজেও জানে যেখানে উপাচার পালন করে পরপারের দ্বার খোলা হয়েছে সেই জায়গাতেই বিপরীত উপাচার করে দ্বার বন্ধ করতে হবে।

— "তুই কি কিছু দেখতে পাসনি?"

— "পেয়েছি।"

— "তাহলে বেরিয়ে যেতে চাইছিস কেন? তুই কি জানিস না যেখানে উপাচার শুরু হয়েছে সেখানেই শেষ করতে হয়?" রণজয় ভ্রূ কুঁচকে তাকাল পলাশের দিকে।

পলাশ রণজয়ের দিকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য হাতটা বাড়িয়ে বলল,

— "আমি এখান থেকে যেতে চাইছি কারণ লাকুনকে ডাকার উপাচার এখানে হয়নি। সেটা অন্য কোথাও হয়েছে। আর আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় আমি জানি সেটা কোথায় হয়েছে।"

* * * * * * * * * *

— "সিকিমের গণতন্ত্রের ইতিহাসটা একটু সংক্ষেপে বলতে পারবি?" প্রশ্নটা পলাশ রণজয়কে করতেই রণজয় একমুহূর্ত কী যেন ভেবে নিলো। গির্জার বাইরে বরফ ঠান্ডা হাওয়ার প্রকোপ বাড়ছে খুব দ্রুত।

— "সতেরোশো শতকে নামগিয়াল রাজবংশ সিকিম রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যটি তখন পরিচালনা করতেন রাজা চোগিয়াল যিনি একাধারে বৌদ্ধ পুরোহিতও ছিলেন। ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অধীনে সিকিম একটি জমকালো রাজ্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও, আর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের পরেও এটি ভারতভুক্ত করা যায়নি। ১৯৭৩ সালে চোগিয়াল প্রাসাদের সামনে রাজতন্ত্র বিরোধী প্রবল বিক্ষোভ আর দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে অবশেষে জনগণ সিকিমীয় রাজতন্ত্রকে দমন করতে সক্ষম হয়। তারপরেই গণভোটের পর সিকিম ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্ত হয়।"

— "ঠিক বলেছিস। ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ ভারতের অধীনে সিকিমকে খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে দেখা হত কারণ তৎকালীন তিব্বতে যাওয়ার পথ একমাত্র সিকিম হয়েই বেরত। তো এই সময় ব্রিটিশ শাসকদের বহু ঊর্ধ্বতন অফিসার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সিকিম জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের মতো করে নিবাস বানিয়ে সেই অঞ্চলেই থাকতে শুরু করেন। তারপর কয়েকপুরুষ ধরে এরা এখানেই কাটান। এরকমই একজন উচ্চপদস্থ

ব্রিটিশ অফিসার স্যার ইউলিয়াম রট কাঞ্জাঙের নীচে নদী তীরে একটি মস্তবড় বাড়ি তৈরি করে পরিবার সহ থাকতে শুরু করেন। এই রট সাহেবের দুই বা তিনপুরুষ পরের জেনারেশন আরান রটকে নিয়েই গোটা ঘটনা।

আরান বিয়ে করেন পাহাড়েরই মেয়ে শিমরাকে। শিমরার পূর্ব পরিচয় আমি জানতে পারিনি। তবে এটুকু জানতে পেরেছি শিমরা অত্যন্ত কুসংস্কারছন্ন ছিল। অগাধ বিশ্বাস ছিল মন্ত্র, তন্ত্র, ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর। আরানের চোখ ফাঁকি দিয়ে ও উইচক্রাফটও চর্চা করত। বিয়ের কিছুকাল পরে শিমরা আর আরানের যমজ ছেলে মেয়ে হয়। তাদের নাম রাখা হয় আরিনা আর টমাস। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া টাকায় আরানের কোনোদিন অর্থের অভাব হয়নি। বিরাট বড় বাড়িতে এই চারজন ছাড়াও ছিল গ্রামেরই এক দিনরাতের কাজের মহিলা। কালচক্রের নিয়ম মেনে সময় বইতে লাগল, ছেলেমেয়েরাও বড় হতে লাগল ধীরে ধীরে। শিমরা প্রায় স্লো পয়জনিং এর মতো করে একটু একটু করে তন্ত্র মন্ত্র কুসংস্কারগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকে। সব কিছুই প্রায় ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু আচমকা এদের মাথার ওপরে হঠাৎ করেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে শ্যাওলাওলা পাথরে পিছলে মেরুদণ্ডে আঘাত পান আরান। আর তারপরই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে চিরকালের জন্য শয্যাশায়ী হতে হল তাঁকে। ডাক্তার, কবিরাজ যখন হাল ছেড়ে দিলো তখন শিমরা মন্ত্র, তন্ত্র, তাবিজ, কবজে ভরিয়ে তুলল আরানকে। এতে অবস্থা আরও খারাপ হতে শুরু করল। অকুল পাথারে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে যখন উদভ্রান্ত শিমরা কী করবে ভেবে উঠতে পারে না ঠিক সেই সময় ওর কোন গুরুভাই ওর হাতে ডেভিলস বাইবেল তুলে দেয়। বিভিন্ন কাল্টের মাধ্যমে সে শয়তানের আরাধনা শুরু করে। বলা ভালো প্রায় অপ্রকৃতস্থ হয়ে ওঠে সে। ছেলে মেয়েকেও সেই সব উপাচারে অংশ নিতে বাধ্য করে।। এইসব উপাচার করতে করতে অনেকদিন যায় কিন্তু শয়তানের তরফ থেকেও কোনো সাড়া মেলে না। আশা প্রায় যখন নিভু নিভু ঠিক এমন সময় নরকের দরজা ডিঙিয়ে ওপারের একজন কয়েকমুহূর্তের জন্য এদিকে চলে আসে। আর সেটা ছিল একজন লাকুন।

কিন্তু এই কয়েকমুহূর্ত থেকেই সে সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র করে ফেলে। সে এসে শিমরাকে শর্ত দেয়— সে তার স্বামীকে সুস্থ করে দেবে। বদলে তাকেও তার হয়ে কিছু কাজ করতে হবে। আর সেই কাজটি হল, 'Remotinem autem infirma'-য় তাঁকে সাহায্য করা!"

— "কী?" মিঃ দত্ত অবাক হয়ে পলাশের মুখের দিকে তাকালেন।

— "Remotinem autem infirma?"

— "এটা আবার কী?" রণজয়, পলাশ আর মিঃ দত্তের মুখের দিকে তাকাল।

— "এটি একটি লাতিন শব্দ, যার বাংলা মানে দুর্বলের অপসারণ।" অন্ধকারেও মিঃ দত্তের চোখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

— "কিন্তু এখানে একটা টুইস্ট আসে। শিমরা বুঝতে পারে, তার হাতে অমোঘ এক সুযোগ এসেছে। আর সেটা সে আরানের জন্য ব্যয় করতে রাজী নয়। সে লাকুনের কাছে স্বামীর সুস্থতার বদলে ডাকিনী বিদ্যায় অজেয় হওয়ার প্রার্থনা করে। আর লাকুন রাজীও হয়ে যায়।

আমি জানি না, লাকুন শিমরার থেকে এই জিনিসই কেন চেয়েছিল, শিমরা রাজি হয়ে যায়। কিন্তু ধূর্ত লাকুন শুধুমাত্র শিমরার প্রতিশ্রুতিতে এতবড় কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেবে এতটাও বোকা সে নয়। সে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ শিমরার মেয়েকে চেয়ে নেয় ফ্রুই সাটানাস হিসেবে। অর্থাৎ যতদিন না পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পাদন হচ্ছে ততদিন শিমরার মেয়ে প্রত্যেকদিন শয়তানের ভোগ হিসেবে নিজেকে নিবেদন করবে। কোনও জীবিত মানুষের ফ্রুই সাতানাস হিসেবে থাকাটা অত্যন্ত বীভৎসতার। শয়তানের ভোগ হওয়া সেই জীবিত মানুষ সব সময় পোসেসড থেকে নিজেকে যত নির্যাতন করবে ততই পুষ্ট হবে শয়তান। ততই সেই মানুষের ওপরে বাড়তে থাকবে শয়তানের প্রতিপত্তি। এরা নিজেরা মানুষ কিন্তু শয়তানের ভোগ হিসেবে এদের নিজের কিছু অপক্ষমতা তৈরি হয় শয়তানের অনুকম্পায়।"

— "কী ধরনের নির্যাতন করে এরা নিজেকে?"

— "অপরিষ্কার থাকা, দিনের পর দিন অনাহারে থাকা, ছেঁড়া পোশাক পরা, হাতপায়ের মাংস কাটা, নিজেই নিজেকে চাবুক মেরে রক্তাক্ত করা।

এরা এগুলো যত করবে...।”

— “শিমরা রাজি হয়ে গেল নিজের মেয়ের এমন ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য?” মিঃ দত্ত অবাক কণ্ঠে প্রশ্নটা করতেই পলাশ বলে উঠল, “ক্ষমতার লোভ বড়ই ছোঁয়াচে মিঃ দত্ত। আর আমরা এটা জানি ডাকিনীতন্ত্রে কেউ কারো নয়। তাই ও রাজি হয়ে যায়। হয়তো ভেবেছিল ও খুব তাড়াতাড়ি পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে পারবে।”

— “তারপর?” রণজয়ের দুই চোখে বিস্ময়।

— “তারপর, লাকুন তাকে পুরো প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দেয় কী করতে হবে। এবং জানায় এই প্রক্রিয়া শুরু করতে গেলে সবার আগে নরকের দ্বারের আগল ভেঙে দিতে হবে যাতে লাকুনেরা ওই জগত থেকে এই জগতে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। আর সে নির্বিঘ্নে এই জগতে এসে রেমোটিনেম আউটেম ইনফিরমার প্রক্রিয়া শেষ করতে পারে। শিমরা দেরি না করে সেই মতো সে কাজ শুরু করে দেয়।

সবার আগে সে উপাচারের স্থল হিসেবে নির্বাচন করে নিজের বাড়িরই বেসমেন্টের ঘরটি। ঘরের মেঝেয় নিজের রক্ত দিয়ে একটা নক্সা আঁকে। একটি বৃত্ত। আর বৃত্তের চারদিকে চারটি অর্ধবৃত্ত। ‘Remotinem autem infirma’-এর চিহ্নস্বরূপ। উপাচারের বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করে একে একে সেখানেই সাজিয়ে রাখে।

তারপর ধীরে ধীরে সুযোগ বুঝে সে গ্রামের চারজন বাচ্চাকে অপহরণ করে হত্যা করে। তারপর সেই সব বাচ্চাদের হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই বেসমেন্টের ঘরের মেঝেতে পুঁতে দেয় জারিত হওয়ার জন্য। শিশুহত্যা করার ফলে ঈশ্বরের পথের সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে যায় এই পরিবার। তারপর একদিন রাতের আঁধারে গির্জার চারকোণে সেই বাচ্চাদের মাংস, চামড়া ছাড়ানো করোটি পুঁতে পাপ বন্ধনে এই গির্জাকেই বেঁধে ফেলে সে। এদিকে ইতিমধ্যে কাঞ্জাঙে চার-চারজন বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ায় হুলুস্থুলু পড়ে যায় গ্রামে। সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

কাজের মহিলা কয়েকদিন ধরেই মালকিনের বদলে যাওয়া রকম-সকম

দেখছিল। সে এসে গ্রামে খবর দিতেই সকলের সন্দেহের তীর তার ওপরে গিয়ে বর্তায়। সকলে যুক্তি করে শিমরাকে হাতে নাতে ধরবে। আর অপরাধের শাস্তি দেবে। যেহেতু অপহৃত চারটি শিশুই হিন্দু ছিল তাই স্বভাবতই গ্রামের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ আর হিংসা প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামের হিন্দুগোষ্ঠীর লোকজন ওত পেতে থাকে। এদিকে ধীরে ধীরে নরকদ্বার ভেঙে লাকুনকে বের করে আনার প্রক্রিয়ায় শেষ ধাপের দিকে এগোয় শিমরা।

এই শেষ ধাপটি ছিল গ্রামের মধ্যে থাকা অবশিষ্ট পবিত্র জিনিসকে অশুদ্ধ করে দেওয়া, আর সেটি হল গ্রামেরই সিমেট্রি আর শ্মশান। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ কিছু মন্ত্রপাঠের সাহায্যে শিশুদের অবশিষ্ট হাড়কে কবরখানা আর শ্মশানভূমির মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। তারপর উপাচারভূমি অর্থাৎ সেই বেসমেন্টের ঘরে ফিরে এসে কিছু রিচুয়ালের মাধ্যমে যে কোনো একজনের নরবলি দিতে হবে। এই নরবলির পর তিনরাত্রি সেইস্থানে কারোর যাওয়া চলবে না। কিন্তু চতুর্থ রাত্রে উপাচারস্থল তিনের অধিক নররক্তে ধুয়ে নরকদ্বারের আগল পুরোপুরি খুলে দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া করতে হবে সঙ্গোপনে। শিমরা মনে করেছিল শ্মশান আর সিমেট্রির কাজ শেষ হলে প্রথম নরবলি হিসেবে বাড়ির পরিচারিকার বলি দেবে। কিন্তু কবরখানায় শিশুদের হাড় পুঁততে গিয়ে উন্মত্ত জনগণের হাতে ধরা পড়ে যায় শিমরা। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার টুকরো টুকরো খণ্ডচিত্রই আমি সিমেট্রিতে পা রেখে দেখতে পাই। প্রক্রিয়ার শেষ অংশটি সে শেষ না করতে পারায় নরকদ্বার ভেঙে আর লাকুন বেরিয়ে আসতে পারে না। গ্রামের লোকেরা যখন তার বাড়ি হামলা করে ওরা বেসমেন্টের ঘরে শিমরার জ্বলন্ত মৃতদেহ খুঁজেপায়। গ্রামবাসীরা ডাকিনীকে জীবন্ত না পেয়ে তার বাড়ি থেকে টেনে বের করে আনে অসুস্থ স্বামীকে। আরানের হাত ধরেই শিমরা এই গ্রামে এসেছিল। সেই অজুহাতে লোকেরা ওকে গির্জার মধ্যেই পুড়িয়ে মারে। বিপদ আন্দাজ করে ছেলে আগে ভাগে বোনকে নিয়ে জঙ্গলের পথে এলাকা ছেড়ে পালায়। আর একটু আগে যে তোর ওপরে হামলা করেছিল সে সম্ভবত শিমরারই পোজেসড হওয়া মেয়ে আরিনা।”

— “তার মানে সেই পর্যটক সেইদিন একলা আসেনি। সাথে ওর বোনও

ছিল। কিন্তু পাদ্রী সাহেব তো তার বোনের কথা বলেননি? তাই না?” রণজয় অবাক হয়ে পলাশের দিকে তাকাল।

গির্জার বাইরেই টর্চের আলো জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে আছে। রাত যত বাড়ছে, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর কুয়াশার আস্তরণ ততই বাড়ছে।

— “কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা” গির্জার সামনে অন্ধকার নির্জন পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে বলে উঠল পলাশ, “সেই পর্যটক যার কথা ফাদার বলেছিলেন, সে শিমরার ছেলে হলে, সে ফিরে এল মায়ের বাকি থাকা উপাচারকে শেষ করতে। নরকদ্বার খুলল, কিন্তু ,নরবলির জন্য নিজেকেই নির্বাচন করল? অথচ খাইসানকে ছেড়ে দিলো? খাইসান ফিরে এল পসেসড হয়ে।

এসে গ্রামে এমন তাণ্ডব শুরু করল যে তিনদিন পর গভীর রাতে তান্ত্রিক ডাকা হল। ধরা যাক ওরা সকলে মিলে আবার খাইসানকে নিয়ে সেই বেসমেন্টের ঘরে গেল। আর সেখানেই ধরা যাক নরকদ্বার খুলে গিয়েছিল। কারণ শিউলিদের বাড়ি গিয়ে যখন প্রথম আমি লাকুনকে দেখেছিলাম তখন সাথে এও দেখেছিলাম একটি ছেলে একাধিক মৃতদেহ একটি গর্তে ফেলছে। কিন্তু এতগুলো কাজ বাকি থাকতে থাকতে পর্যটক নিজেকে বলি দিয়ে দিল। ব্যাপারটা কেমন একটা অদ্ভুত না?”

— “তোমাদের মনে যে প্রশ্ন আছে সেটা একমাত্র সেই বাড়িতে গেলেই জানা যাবে।” মিঃ দত্ত পলাশের দিকে তাকালেন। “এমনও তো হতে পারে, এখানের মতো ওখানে গেলেও ওখানে হওয়া ঘটনাগুলো পরপর দেখতে পেয়ে গেলে।”

— “তার জন্য আমাদের ফাদার ডেংপোর সাহায্য চাই।” পলাশ বলে উঠল, “ওই ঘরটি ঠিক কোথায় আমরা তো সেটা জানি...” কথাটা শেষ হল না, তাঁর আগেই রণজয় আতঙ্কে পলাশের কাঁধ খামচে ধরল। পলাশ চমকে উঠে রণজয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দেখল রণজয়ের হাতে জ্বলা টর্চলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলো অন্ধকার ভেদ করে ওদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে পড়ছে। আর সেই উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে ফুটে উঠেছে এক ভয়ঙ্কর শরীর।

পলাশ এই প্রথম সেই ভয়ঙ্করীকে দেখল। কী বীভৎস দেখতে এই জ্যান্ত পিশাচিনীকে। শয়তানের ভোগের জ্যান্ত নৈবেদ্য যে কতটা নির্মম, কতটা বীভৎস আর কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মহিলা।

মিঃ দত্ত পাথর শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই ভয়ঙ্করীর দিকে। হয়তো ভাবার চেষ্টা করছেন এই ভয়ঙ্করীর আসল উদ্দেশ্য।

মিঃ দত্ত বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "তোমরা তৈরি থেকো। এ কোনো ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে এসেছে।"

সাথে সাথে একটা ভয়ঙ্কর খিলখিলে হাসিতে ভরে গেল চতুর্দিক। হ্যাঁ ওই ভয়ঙ্করী হাসছে। হেসেই যাচ্ছে হেসেই যাচ্ছে। যেন ভারী কোনো মজার জিনিস দেখতে পেয়েছে সে। তারপর হঠাৎ করেই হাসি থামিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকালো ওদের দিকে। সেই খর দৃষ্টিতে নরকের আভাস। সে দৃষ্টিতে প্রতিশোধের জ্বালা ধরানো আগুন।

সেই ভয়ঙ্করী ডান হাতের তর্জনী তুলে ওদের তিনজনকে নির্দেশ করে বলে উঠল, "ভুল করেছিস! তোরা ভুল করেছিস এখানে এসে। তোরা কী ভেবেছিস, কালবৃত্তের কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবি? পারবি না। নরকের প্রভু তোদের কালবৃত্তের জালে বেঁধে ফেলেছেন। তাঁকে আটকানোর সাধ্যি তোদের নেই।"

কালবৃত্ত! কালবৃত্ত নামটা ভীষণ চেনা চেনা লাগছে পলাশের। কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। কোথায় যেন পড়েছে। কোথায় যেন শুনেছে শব্দটা।

রণজয় প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে যাবে এমন সময় বিকট মাংস পচা গন্ধ বাতাস ভারী করে তাদের নাকে ধাক্কা মারল। একটা হিমশীতল ঠান্ডা হওয়া হঠাৎ করেই বয়ে গেল ওদেরকে কাঁপিয়ে। চমকে উঠল ওরা তিনজন। ও কীসের শব্দ বেরিয়ে আসছে অন্ধকার ঘরগুলো থেকে? একাধিক হিসহিসে শব্দ বাতাস ছাপিয়ে যেন ওদের কানে এসে ধাক্কা মারছে।

রণজয় টর্চের আলো ফেলল ঘরগুলোর দিকে। ওকি! একাধিক কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা ঘরের ভেতরে পাক খাচ্ছে। রণজয় পলাশের দিকে তাকালো। পলাশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে অজান্তেই। সাথে

সাথে জ্বলন্ত টর্চখানা মাটিতে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রণজয়। ওদিকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে ওদের বৃত্তাকারে ঘিরে ধরল অচিরেই।

পলাশ একমুহূর্ত দেরি না করে বীজমন্ত্র স্মরণ করার চেষ্টা করল। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হওয়ার পর সে নিজে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রই পারে এই মুহূর্তে তার অন্তরশক্তি জাগরিত করতে। কিন্তু একী? চোখ বন্ধ করে সে যতই মন্ত্র স্মরণ করার চেষ্টা করছে ততই ভুলে যাচ্ছে এক একটা মন্ত্র। ভয় পেয়ে সে সাথে সাথে রণজয়ের দিকে তাকাল।

রণজয়ও বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

— "আমি আমার বীজমন্ত্র মনে করত পারছি না পলাশ।" প্রায় আর্তনাদ করার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল রণজয়।

পলাশ বুঝল এক ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গিয়েছে ওদের সাথে। কেউ ওদের স্মৃতির পাতা থেকে মায়াবী ইরেজার দিয়ে মুছে দিয়েছে সব পরিচিত মন্ত্র।

হঠাৎ আবার সেই ভয়ঙ্করী রক্ত জল করা ভঙ্গিতে হেসে উঠল,

— "কীরে? মনে পড়ছে না? পড়ছে না তো মন্ত্রগুলো মনে? পড়বে কী করে? আমি যে সব মন্ত্র তোদের মাথার ভেতর থেকে মুছে দিয়েছি। শয়তানের ভোগের ক্ষমতা কম ভেবেছিস? খিক্ খিক্।"

শিউরে উঠল দু'জনেই। এবার? এবার কী হবে?

ওদিকে যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওদের ঘিরে ধরেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে মানুষের শরীরের অবয়ব নিচ্ছে। এই মানুষদের সব একই রকম দেখতে। মাথা ন্যাড়া, নখ উপড়ানো, সারা শরীরের চামড়া ঝলসানো, চোখের দৃষ্টিতে শীতল ক্রূরতা। লাকুন এদের আত্মাকে পাঠিয়েছে ওদের শেষ করতে। এরা কাঞ্জাঙের গ্রামবাসী।

— এত জন? ওরা পারবে? এখন ওদের একমাত্র ভরসা মিঃ দত্ত।

"Hail Mary– full of grace– the Lord is with thee..."

মিঃ দত্ত শুরু করে দিয়েছেন আভে মারিয়া মন্ত্রপাঠ। কিন্তু একী! মন্ত্রপাঠ করতে করতে থেমে যাচ্ছেন কেন উনি?

— "আমি... আমি ভুলে যাচ্ছি... আমার মনে পড়ছে না..." ফিসফিস করে

বলে উঠলেন মিঃ দত্ত। পলাশ দেখল, তাঁর মুখে-চোখে ভয়।

— "বাইবেল... আপনার ব্যাগ থেকে বাইবেলটা বার করুন..." , বলে উঠল পলাশ।

মিঃ দত্ত তাঁর ব্যাগ ঘাঁটতে শুরু করলেন। উফ, এত সময় নিচ্ছেন কেন উনি? ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে এতক্ষণ লাগে? পলাশ উত্তেজিত হয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল "তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি!"

এত সময় কি এরা দেবে? এরা যে সংখ্যায় প্রচুর! কে নেই এই দলে? গ্রামের বাচ্চা, পুরুষ, মহিলা, বুড়ো, বুড়ী যারা সকলেই উবে গিয়েছিল কর্পূরের মতো তারা সবাই এসেছে ওদের ওপরে হামলা করতে। খাইসান নরকদ্বার খুলে দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে লাকুন বেরিয়ে এসেছিল সেই রাতে। সেই রাতেই লাকুন এদের দেহ থেকে আত্মা টেনে বের করে নিজেদের কাছে বন্দী করে রাখে। নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। বিনষ্ট হয় এদের নশ্বর দেহ। এখন বিপদ দেখে লাকুন ওদের ওপরে হামলা করতে এই সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মাদের পাঠিয়েছে। কিন্তু এই এত আত্মাদের কীভাবে আটকাবে ওরা? এত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাওয়া শক্তি পুনরুদ্ধারের মন্ত্র যে পলাশ ও রণজয়ের জানা নেই! ওদের শিক্ষা যে এখনো অসম্পূর্ণ!

পলাশের কপালে ঘাম দেখা দিল। নাহ, মিঃ দত্ত ক্রমাগত ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে চলেছেন, কিন্তু কিছুতেই বাইবেল বের করে আনতে পারছেন না। কী করে তাহলে আটকানো হবে এদের? এরা যে বড় ভয়ঙ্কর! না এরা পূর্ণ নরকজীব, না আছে এদের কোনো দেহ।

আর ঠিক তখনই একটা বজ্র কণ্ঠ ঠিক যেন ওদের সামনে থেকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল। চমকে উঠল ওরা তিনজন। থমকে দাঁড়ালো, সেই অশরীরী জীবন্ত আত্মার দল।

একটা মন্ত্র পাঠ করতে করতে কেউ এগিয়ে আসছে গ্রামের মাঝপথ ধরে। কালো পোশাকে ঢাকা সারা শরীর। এক হাতে একটা লণ্ঠন। দূর থেকে মুখ বোঝা যাচ্ছে না। অজানা ভাষার মন্ত্রবন্ধনী ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে কাঞ্জাঙের বাতাসে। মন্ত্রপাঠ করতে করতে সেই আগন্তুক ধীরে ধীরে ওদের দিকেই এগিয়ে

আসছেন। এক পা এক পা এগোচ্ছেন আর পাল্টে যাচ্ছে সেই মন্ত্রপাঠের সুর। এই মন্ত্রপাঠ এতক্ষণ প্রায় নির্লিপ্ত থাকা জীবন্ত প্রেতেদের মধ্যে যেন বিষক্রিয়া শুরু করল। হুড়োহুড়ি পড়ে যেন গেল ওদের মধ্যে। যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে বাঁচল যেন। একটা প্রবল হুড়োহুড়ি শুরু হল জায়গাটা জুড়ে।

দেখতেই দেখতে ওরা একে একে বাতাসে মিলিয়ে যেতেই আগন্তুক ওদের একেবারে কাছে এসে উপস্থিত হল। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ফাদার ডেংপো। অবাক হয়ে রণজয় ও পলাশকে দেখছেন।

কিন্তু তিনি কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই কী একটা মনে পড়তেই পলাশ নিজের হাতের কবজিটা বাড়িয়ে প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে উঠল, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে রণ। কালবৃত্ত মানে কী! এই চিহ্নের মানে কী! Remotinem autem infirma'-র মানে কী! সব সব মনে পড়েছে, সব। তুই ভাবতে পারবি না রণ কত বড় ষড়যন্ত্র এটা!"

(৮)

।। ভগ্নদ্বার প্রবেশম।।

—"আমি জানতাম, তাই বারবার আসা এই চিহ্নটা আমার এত চেনা লাগছিল।" পলাশ বিরক্তির সাথে বিড়বিড় করে উঠল, "Remotinem autem infirma — এই শব্দটা তাই আমার চেনা লাগছিল এই একই কারণে।"
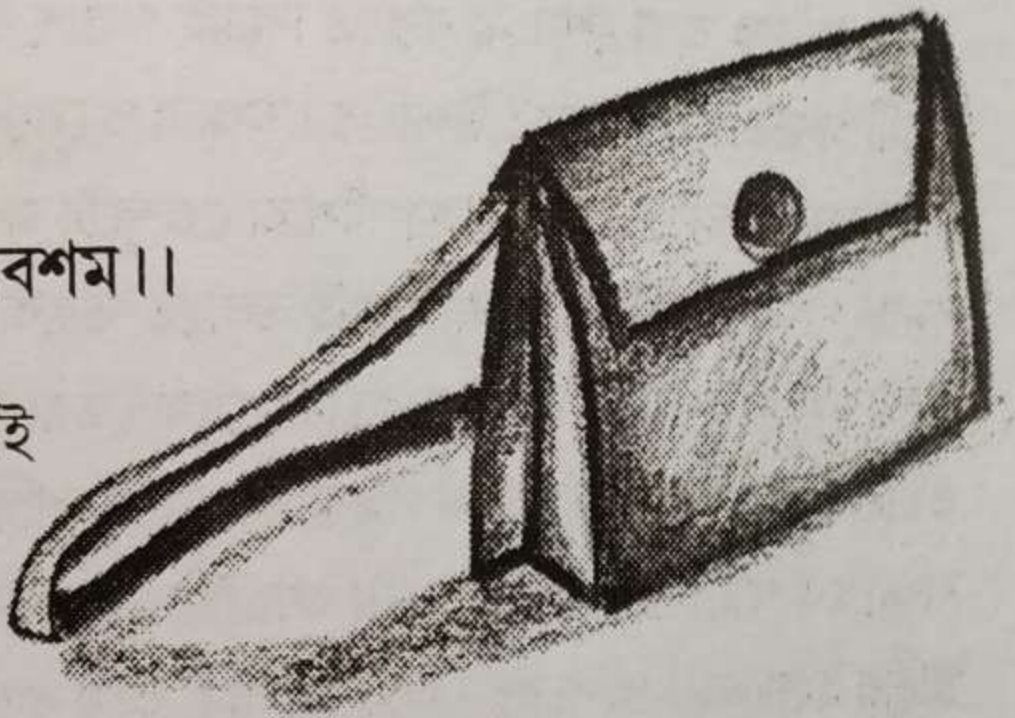
কনকনে ঠান্ডা পাহাড়ি হাওয়া রাত্রি বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। রণজয় হাতঘড়ি দেখল। রেডিয়াম ডায়ালে তখন রাত্রি একটা বাজার ইঙ্গিত। অনেকক্ষণ পেটে কিছুই পড়েনি। সেই কোন সন্ধ্যেবেলায় ফাদারের দেওয়া চা আর শুকনো বিস্কুট খেয়েছিল। পেটে যেন ছুঁচো ডন বৈঠক মারছে। ওরা সকলেই ধীরে ধীরে সরু পাকদণ্ডী বেয়ে নীচের দিকে পরপর নামছে। সকলের

সামনে ফাদার ডেংপো। হাতে টর্চলাইট নিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলছেন। তারপরে পলাশ, তারপর রণজয় আর সব শেষে মিঃ দত্ত। রাতের আঁধারে ওদের গন্তব্য রট সাহেবের বাড়ি।

— "একটি বৃত্ত আর বৃত্তের পরিধি ছুঁয়ে থাকা বহির্মুখী চারটি অর্ধবৃত্ত। এটি কালবৃত্তের সঙ্কেত। অনেক সময় এটিকে চতুঃশৃঙ্গ উপাচার বলা হয়।"

— "এক মিনিট!" মিঃ দত্ত হঠাৎ অবাক গলায় বলে উঠলেন, "চতুঃশৃঙ্গ উপাচার! অর্থাৎ Four horn ritualæ"

— "কালবৃত্তের সঙ্কেতকে অনেকে 'Four horn ritual' বলে।" পলাশ ফাদারের পেছনে নামতে নামতেই কথা বলে যাচ্ছে। ওর কথায় হালকা হাঁপানির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। স্বাভাবিক। পাহাড়ে চড়াই উৎরাই সহজ নয়।

— "এটি তো অত্যন্ত গূঢ় মন্ত্রপ্রণালী। এটা জানা কোনোদিন কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষের সম্ভবই নয়। এটি আসলে...।"

মিঃ দত্তকে কথা শেষ না করতে দিয়েই পলাশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটি ক্ষমতা অধিকারের উপাচার। আমরা অনেকে মানি এইজগত যা চোখে দেখা যায় তা ছাড়াও তার পাশাপাশি আরও দুটো জগত আছে। স্বর্গ আর নরক। সমস্ত পজিটিভ কিছুর আধার যেই জগতে তাকে স্বর্গ বা হেভেন বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয় স্বর্গে দেবতারা, দেবদূতেরা আর ভালো যা যা কিছু সব ওখানেই থাকে। অপরপক্ষে সমস্ত নেগেটিভ শক্তি বা খারাপ কিছু তা হেল বা নরকে থাকে। আর এই দুটো জায়গাকে আমাদের এইজগত একটা সূক্ষ্ম প্রাচীর হয়ে একে অপরের থেকে আলাদা করে রাখে। কিন্তু এই দুটি জগতের পজিটিভ বা নেগেটিভ শক্তি যখন আমাদের জগতের প্রাচীর ওভারল্যাপ করে তখনই এক জগতের প্রভাব অন্য জগতে পড়ে।

আমরা মনে করি স্বর্গে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই ভালো কিংবা তাঁরা কোনো ভুল করতেই পারেন না। কিন্তু দেবতা, বা দেবদূতেরা যে সব সময় ঠিক হন তা নয়। তাঁরাও ভুল ত্রুটি করেন। আর সেই জন্য তাঁদের অভিশাপও ভোগ করতে হয়। এই অভিশাপ ভোগকালে তাঁদের যাবতীয় পূর্বের ক্ষমতা সব কেড়ে নেওয়া হয়।

অভিশাপের মেয়াদ কাল শেষ হলে তাঁরা স্বর্গে ফিরে যান ঠিকই, কিন্তু তাঁরা পূর্বের ক্ষমতা ফিরে পান না। কারণ তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের অধিকার অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়। যিনি অভিশাপগ্রস্ত হন তাঁর মধ্যে একটা মরিয়া প্রচেষ্টা থাকে নিজের পূর্বের ক্ষমতা, পূর্বের অধিকার ফিরে পাওয়া নিয়ে। তখন সেই পুরাতন বা নতুন দু'জনের মধ্যে একটা দ্বৈরথ চলে। এই দ্বৈরথ মেটানোর জন্য চতুঃশৃঙ্গ উপাচার আহ্বান করা হয়। এই অত্যন্ত কঠিন উপাচার যে আগে সম্পাদন করতে পারবে সে সেই অধিকার লাভ করবে। আর অপরজন পরাজয় শিকার করবে চিরকালের জন্য।"

মিঃ দত্ত পেছন থেকে বলে উঠলেন, "তুমি যা বললে তাতে মনে হল পুরোটাই স্বর্গের সাথে জড়িত। কিন্তু এই কালবৃত্তের সঙ্কেত বলো বা চতুঃশৃঙ্গের উপাচার এর সাথে 'Remotinem autem infirma'-র বা কী সম্পর্ক? আর লাকুনেরাই বা এসব করতে কেন চাইছে। কী স্বার্থ ওদের এসব করে?"

কয়েক মুহূর্ত থেমে পলাশ ধীরে ধীরে বলে উঠল, "লাকুনদের দলপতি, নরকের আটজন রাজার একজন রাজা হতে চাইছে।" ফাদার ডেংপো থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ঘুরলেন।

রণজয়ও থমকে দাঁড়িয়ে অবাক সুরে বলে উঠল, "মানে?"

পলাশের একটানা এতটা খাড়াই পথ নামার অভ্যেস একেবারেই নেই। সে পাকদণ্ডীর পাশেই একটা বড় পাথরের ওপরে বসল।

— "যাঁরা বাইবেলে নরকের কনসেপ্ট এর ওপরে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা জানেন নরকে আটজন রাজা আছেন। তাঁরাই পুরো নরকের ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করেন আর সেখানে শাসন করেন। এই প্রত্যেক রাজার অধীনে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যার লিজিওন অফ স্পিসিস বা নরকজীব আছে। এবার রাজাদের এই সিংহাসন কিন্তু অক্ষয় নয়। এদের অধীনস্থ কোন নরকজীব যদি রাজার থেকেও বেশি সংখ্যক লিজিয়ন অফ স্পিসিস নিজের আওতায় আনতে পারে, সে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারবে। তাই রাজাদের সব সময় একটা মরিয়া প্রচেষ্টা থাকে নিজের অনুগত নরকজীবদের দমিয়ে রাখা, যাতে তারা কোনোদিন রাজদ্রোহ না করতে পারে। আর লাকুন ঠিক এটাই করতে চাইছে।"

কথা বলতে বলতে পলাশ খেয়াল করল ফাদার ডেংপো মাঝে মাঝেই আড়চোখে মিঃ দত্তকে দেখছেন।

— "ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার নয়।" রণজয়ের গলার স্বরে ঈষৎ উষ্মা।

একটা জোরে শ্বাস ছাড়ল পলাশ, "তোর নিশ্চয়ই মনে আছে তুই বলেছিলি, লাকুনেরা নরক অধীশ্বর বালামের অধীনস্থ। এই বালাম অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির অত্যাচারী রাজা। আর আমার ধারণা লাকুনেরা বালামকে লুকিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র করছে। যাতে ওরা বালামকে সরিয়ে নিজেরা সিংহাসন দখল করতে পারে। 'Remotinem autem infirma' কিন্তু সেই জিনিসেরই ইঙ্গিত করছে।"

— "একদম!" পলাশ টের পেল কথাটা বলতেই অন্ধকারেই যেন মিঃ দত্তের চোখজোড়া চকচক করে উঠল।

— "Remotinem autem infirma-র মানে দুর্বলের অপসারণ। আবার কালবৃত্তের সঙ্কেত নির্দেশ করছে ক্ষমতার অধিকার। দুটো যদি একসঙ্গে মেলানো যায় তাহলে লাকুনদের মূল উদ্দেশ্য হল যে দুর্বল তাকে সরিয়ে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ ও যদি নরকরাজ বালামের থেকে বেশি নরকজীবের অধিকারী হয়ে পড়ে তাহলে ও সহজেই বালামকে হারিয়ে দেবে।"

— "কিন্তু তাতে আমাদের কী?" রণজয় নরম মাটির ওপরে পা ঠুকল। বোঝা যাচ্ছে ও বেশ বিরক্ত, "ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক তাতে আমাদের কী? কে রাজা হবে বা হবে না তাতে আমাদের কী?"

— "তাতে তোর হয়তো কিছু নয় কিন্তু আমার অনেক অসুবিধে হবে।" পলাশ কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো, "বালাম ধূর্ত হতে পারে, শয়তান হতে পারে। কিন্তু লাকুনের মতো ঘৃণ্য নয়। লাকুনদেরর যা চরিত্র তারা যদি একবার বালামের ক্ষমতা পেয়ে যায় তাহলে সবার আগে তারা চাইবে সমস্ত নরকদ্বার ভেঙে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে। আর একবার এটা হলে লক্ষ লক্ষ নরকজীব পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াবে আর তখন ওকে আটকানো আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে যাবে।"

— "একদম ঠিক বলেছ।" ফাদার ডেংপো বলে উঠলেন, "ওকে আমাদের

আটকাতেই হবে।"

— "তো এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ?" মিঃ দত্ত পলাশের মুখের দিকে তাকাল।

পলাশ রণজয়ের মুখের দিকে তাকালো, "আমায় দেখতে হবে নরকের দ্বার কোনোভাবে বন্ধ করা যায় কিনা। যদি কোনোভাবে সেই দরজা বন্ধ করা যায় আমি তা বন্ধ করে দেব। তাহলে লাকুন সেই দরজা দিয়ে না বেরোতে পারবে, না ঢুকতে পারবে। আর তাতেই আসল কাজ হয়ে যাবে।"

* * * * * * * * * *

নদীর ধারটিতে রণজয়, পলাশ আর ফাদার ডেংপো দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের তিনজনের দৃষ্টি সামনের দিকে দোদুল্যমান টর্চের আলোর দিকে।

মিঃ দত্ত টর্চের আলো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে যাচ্ছেন। কারণ ওনার শিশিতে সংরক্ষিত করে রাখা পবিত্র জল বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই বেসমেন্টের ঘরে গিয়ে যদি পবিত্র জলের দরকার পড়ে?

— "আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি আপনি মিঃ দত্তকে আড়চোখে দেখছেন। কী হয়েছে ফাদার?"

ফাদারের পিঠে মিঃ দত্তের ব্যাগ। তিনি সেটাকে বুকের সামনে এনে বললেন, "কেন জানি না, ভদ্রলোকের উপস্থিতিটা আমার ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা এনাকে তোমরা কীভাবে চিনলে?"

রণজয় যত দ্রুত সম্ভব সংক্ষেপে পুরোটা বলার চেষ্টা করল। মিঃ দত্তর সাথে কীভাবে পরিচয়, কীভাবে উনি ওদের এখানে আনলেন, কীভাবে উনি মাঝপথেই হারিয়ে গেলেন, কীভাবে উনি গির্জায় পুনরায় এসে ওদের বাঁচালেন সব একে একে বলে গেল। রণজয় সংক্ষেপে এও বলতে ভুলল না উনি পূর্বে নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন পরে দিয়েছিলেন নিজের আসল পরিচয়।

সব শুনে ফাদার ডেংপো অবাক সুরে বলে উঠলেন, "তোমরা তো মিঃ অভিজিত দত্তকে বা তাঁর ছবিও দেখনি? তাহলে ইনিই যে সেই ব্যক্তি তা কীভাবে বিশ্বাস করলে? শুধুমাত্র এনার মুখের কথায়? হতেও তো পারে ইনি

পরেও নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন সেটাও এনার আসল আসল পরিচয় নয়।"

— "এসব আপনি কী বলছেন ফাদার? উনি অন্য কেউ মানে?" রণজয় অবাক।

— "আমার ইন্দ্রিয় কিন্তু বারবার এই লোকটি সম্পর্কে অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে।" ফাদার ডেংপোর কথা শুনে দু'জনেই অবাক হল।

— "অবাক হচ্ছ তাই না। কিন্তু এইরকম ভয়ঙ্কর জায়গায় এরকম আগ বাড়িয়ে আলাপ জমানো লোককে কীভাবে বিশ্বাস করবে? ধরো এ যদি শয়তানের কোনো অনুচর হয়? তোমাদের ক্ষমতা দেখে ভয় পেয়ে তোমাদের সাথে মিশেছে। আর অপেক্ষা করছে কোনো দুর্বল মুহূর্তের।"

— "তাই যদি হয় তাহলে গির্জার মধ্যে ও আমাদের জীবন বাঁচাবে কেন? ওর মন্ত্র শুনেই তো সেই ভয়ঙ্করী পালিয়ে গেছিল গির্জা ছেড়ে..." রণ একগুঁয়ের মতো চাপা স্বরে তর্ক করে চলছে।

— "বাইবেলের 'গসপেল অফ ম্যাথিউ' অংশে বলা হয়েছে, প্রভু যীশু যখন একের পর এক মিরাক্যাল করছেন, বিশেষত কেউ পোজেসড হলে যীশু সেখানে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে সেই প্রেতাত্মা তাঁর শিকার ছেড়ে পালাচ্ছে। তখন ফরাজিরা অভিযোগ করেন যীশু নাকি মন্দ আত্মাদের রাজা বেলসবুলের সাহায্যে মন্দ আত্মা তাড়ান। বাইবেলের এই কাহিনী তোমাদের এই জন্য বললাম, যে শয়তানদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের প্রবণতা আছে। হয়তো এই লোকটি সেই ভয়ংকরীর থেকেও বেশি শক্তিশালী। "

ফাদার ডেংপোর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মিঃ দত্ত ফিরে এলেন। পলাশ এতক্ষণ চুপ করেছিল। টর্চের সাদা আভায় পলাশ দেখল রণজয়ের স্থির দৃষ্টি মিঃ দত্তের ওপরে নিবন্ধ।

— "আপনার হয়েছে?" পলাশের প্রশ্নে মিঃ দত্ত সম্মতির সাথে মাথা নেড়ে নিজের ব্যাগ ফিরিয়ে নিলেন।

— "বেশ তাহলে চলুন। এগিয়ে যাওয়া যাক।"

সবার আগে আগে হাঁটছেন ফাদার ডেংপো তাঁর পিছনে মিঃ দত্ত। অন্তত এখনো ভদ্রলোক নিজের এই পরিচয়ই দিয়েছেন। সবার শেষে রণজয় আর

পলাশ। ওদের দু'জনেরই কপালের ভাঁজে দুশ্চিন্তার ঘন কালো মেঘ। ফাদার ডেংপোর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করবার মতো একেবারেই নয়। সত্যিই তো লোকটি নিজের যা পরিচয় দিয়েছে তা তো পূর্বের মতো মিথ্যে হতেই পারে। কে বলতে পারে এ শয়তানের কোনো অনুচর নয়?

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি কথা বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো করে পলাশের মাথার ভেতরে ধাক্কা মারল। সে চমকে উঠে পাশে পাশেই হাঁটতে থাকা রণজয়ের কাঁধ খামচে ফিসফিস করে বলে উঠল, "মিঃ দত্ত নামের লোকটিই শিমরার হারিয়ে যাওয়া ছেলে নয় তো?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রণজয়। সত্যি তো, সে এসব কিছু ভেবে দেখেনি এতক্ষণ। এই লোকটি যদি শিমরার সেই ছেলেটি হয় তাহলে তো এতক্ষণের না মেলা অঙ্কও মিলে যাচ্ছে। হয়তো সেই বিদেশি পর্যটক নয়, এই লোকটিই রট পরিবারের শেষ পুরুষ। এ হয়তো সেদিন এই গ্রামেই ছিল। যে উপাচার করে বিদেশি পর্যটকের বলি দিয়েছিল প্রথমে। তারপর খাইসানের মাধ্যমে বাকি উপাচার পূরণ করে নরকদ্বার খুলে দিয়েছে।

হঠাৎ ওদের দু'জনকে দাঁড়াতে দেখে সেই লোকটি চাপা স্বরে বলে উঠল, "কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? কিছু হয়েছে?"

রণজয় দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, "নাহ। আপনি এগোন, আমরা আসছি।"

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত যেন ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারপর আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

— "আমাদের সাবধানে থাকতে হবে রণ! অপরাধী অনেক অনেক ধূর্ত। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপরে হামলা হতে পারে।"

ঠিক এমন সময় পলাশ যেন কী একটা রণজয়ের পকেটে চালান করে দিতেই চমকে উঠল রণজয়।

— "কী দিচ্ছিস এটা?"

— "কিছু না।" পলাশ রণজয়কে আশ্বস্ত করে বলে উঠল, "যদি কখনও মনে হয় তোর কাছে আর কোনো উপায় নেই। তখনই এটা বের করিস।

তার আগে নয়।"

— "কিন্তু কী দিলি, সেটা তো বল।"

— "পরে বলব। এখন চল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বাকিরা সন্দেহ করবে।" কথাটা বলেই একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আবছা পাথরের পথ বেয়ে পলাশ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অগত্যা রণজয়কেও পলাশের পিছু নিতে হল।

কিন্তু সে বুঝতে পারছে কেউ যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। এই অদ্ভুত উত্তেজনাটা এর আগে কখনই হয়নি তার। কারণ সে জানতো তার কাছে মন্ত্রের শক্তি আছে। কিন্তু একটু আগেই যা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হল তাতে নিজেকে বড়ই নিঃস্ব আর শক্তিহীন মালুম হচ্ছে তার।

সে তখন থেকে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজের বীজমন্ত্র স্মরণ করার, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। আচ্ছা, মহারথী কর্ণেরও এমন দশা হয়েছিল না? ভগবান পরশুরামের অভিশাপে চরম বিপদের সময়ে সমস্ত বিদ্যা তিনি ভুলে গিয়েছিলন। তাদেরও কি কর্ণের দশা হবে? আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা দু'জনেই কি খুব বড় ঝুঁকি নিয়ে নিলো?

ঠিক এমন সময় রণজয় দেখল ফাদার ডেংপো হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তার হাতের উজ্জ্বল টর্চের আলো ওদের পথ আটকে রাখা একটা বিশাল মরচে পড়া পুরনো লোহার গেটের ওপরে পড়ছে। দুই দিকের দুই ক্ষয়িষ্ণু উঁচু স্তম্ভ কোনোরকমে ধরে রেখেছে এই বিশাল লোহার গেটটিকে।

ফাদার ডেংপো একবার পলাশ আর একবার রণজয়ের দিকে তাকালেন। পলাশ কিছু একটা ভাবছে সেই গেটের দিকে তাকিয়ে।

মিঃ দত্ত বলে উঠলেন, "ভেতরে যেতে হবে তো?"

পলাশ মাথা নাড়াল। হ্যাঁ, তাদেরকে ভেতরে যেতে হবে। দেরি না করে পলাশ মরচে ধরা লোহার বিরাট বড় গেটটাতে ধাক্কা দিতেই কলকব্জাগুলো ক্যাঁচকোচ করে বিকট শব্দ তৈরি করল। টর্চের আলোটা ফেলে ফাদার ডেংপো চারিদিক দেখছেন। রণজয়ের চোখ আটকে গেল সামনের বিস্তৃত বাগানের শেষপ্রান্তে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট কালোরঙের দৈত্য আকারের স্থাপত্যে। একটা বিরাট বড়ো কাঠের বাড়ি।

ফাদার ডেংপো রণজয়ের কানের পাশে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, — "ওটাই সেই অভিশপ্ত বাড়ি।"

পলাশের পেছনে পেছনে এক এক করে সকলে প্রবেশ করতেই পলাশ দরজাটা আবার লাগিয়ে বলে উঠল, "আপনারা একটু সরে দাঁড়ান। আমি দ্বারবন্ধকী করব।"

রণজয় অবাক, "তুই তোর মন্ত্র মনে করতে পেরেছিস? আমি কেন পারছি না তাহলে?" ওর কণ্ঠে হতাশা।

— "চাপ নিস না। সব মনে পড়ে যাবে। আমিও তো সব মনে করতে পারছি না। তবে এটা মনে হয় পারব।"

ওরা পলাশের থেকে একটু তফাতে পিছিয়ে আসতেই, পলাশ চোখ বন্ধ করে ইষ্টকে স্মরণ করল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যেই হাত দুটি দিয়ে শূন্যে একটি বিশেষ মুদ্রা আঁকতেই একটা সবুজ আভা পলাশের হাতের তালু থেকে বেরিয়ে সেই লোহার দরজায় মিশে গেল। এরপর বাইরের না কোনো অপশক্তি ভেতরে ঢুকতে পারবে। আর না ভেতরের কোনো অপশক্তি বাইরে যেতে পারবে।

তারপর ফাদার ডেংপোর হাত থেকে টর্চলাইট নিয়ে সামনের পথ ধরে এগিয়ে গেল পলাশ। রণজয়ও আর অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে পলাশের পিছু নিলো।

বাড়ির সদর দরজা ভেজানোই ছিল। দেওয়ালের কাঠগুলো রোদ জ্বলে, বৃষ্টিতে ভিজে, অযত্নে শ্যাওলার পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। বাইরে থেকে যে জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে তার কাচের পাল্লার একটাও কাচ অবশিষ্ট নেই। চারিদিকে পুরু ধুলোর আস্তরণ। কিন্তু সেই ধুলোর আস্তরণের ভেতরেও একাধিক সদ্য পায়ের ছাপ এটা প্রমাণ করছে যে কিছুদিন আগেই বেশ কিছু লোকের আনাগোনা হয়েছে এই বাড়িতে। সদর দরজায় ঝুলছে ভাঙা শেকল আর তালা। দরজার হাতলের কাছের কিছুটা অংশ ভাঙা। ঠিক যেন কেউ শাবলের চাড় মেরে দরজা খোলার চেষ্টা করছিল।

ঠিক এমন সময় মিঃ দত্ত কী একটা দেখতে পেয়ে চৌকাঠের সামনের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। পলাশ সেই দিকে টর্চের আলো ফেলতেই বুঝতে পারল ফোঁটা ফোঁটা কালচে রক্তের ধারা আধ ভেজানো দরজার নীচ থেকে

বেরিয়ে বাইরের পাথুরে পথে গিয়ে মিশে গিয়েছে।

— "এগুলো কি রক্তের ধারা?" ফাদার ডেংপো অবাক হয়ে প্রশ্নটা করলেন।

পলাশ রণজয়ের দিকে তাকালো, "আমার ভিশন একদম ঠিক। সেই গির্জায় কোনো উপাচারই হয়নি। নরকদ্বার খোলার উপাচার এখানেই হয়েছে। এই ঘরেই। এখানেই সেই পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। তারপর খাইসান এখান থেকেই তার কাটা মুণ্ডুটা বাইরে বের করে নিয়ে গিয়েছে। তারপর তা টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল গির্জার চৌকাঠে। এই রক্তের ফোঁটা সেই পর্যটকেরই কাটা মুণ্ডু থেকে ঝরে পড়া রক্ত।"

* * * * * * * * * *

— "এবার আমরা কী করবো? নরকের দ্বার বন্ধ করা যাবে কি? তুমি কি এই ব্যাপারে কিছু ভেবেছ পলাশ?"

মিঃ দত্ত পলাশকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে উঠতেই রণজয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। লোকটা এখনো নাটক করে যাচ্ছে? একই ভাবে?

কিন্তু তাঁকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই পলাশ বলে উঠল,

— "আমাদের সেই বেসমেন্টের ঘরে যেতে হবে। সেখানেই নরকের দ্বার খোলা হয়েছিল। সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারব না দরজাটা কীভাবে বন্ধ করবো।"

— "কিন্তু এত বড় বাড়ির মধ্যে আমরা বেসমেন্টের ঘরটি খুঁজে পাব কী করে?" ফাদার ডেংপো অবাক চোখে তাকালেন পলাশের দিকে। ফাদারের কথা শুনে পলাশের ঠোঁটের কোলে মুচকি হাসি দেখা দিলো।

সে টর্চ লাইটের আলো ঘরের বাঁদিকে মেঝেতে নিক্ষেপ করতেই দেখা গেল, একাধিক টাটকা জুতোর ছাপ আর কালচে রক্তের ফোঁটা সদর দরজা থেকে ঘরের বাঁদিকের একটি দরজার ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

— "লাকুন না চাইলেও সে আমাদের বেসমেন্টের ঘরটি চেনানোর ব্যবস্থা করে রেখেছে।"

* * * * * * * * * *

—"মিঃ দত্ত, আপনি আর ফাদার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিন। আমি রণজয়কে নিয়ে ভেতরে যাচ্ছি। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিন। তবে আমি বা রণজয় ডাকলেই যেন আপনি দরজাটা খুলে দেন। নরকের দ্বার খোলা হয়ে আছে। সেখান থেকে কোন জীব কীভাবে বেরিয়ে আসবে তার ঠিক নেই।"

পলাশের দৃষ্টি ওদের সামনে খোলা দরজার ওপারের গাঢ় অন্ধকারের দিকে। দরজার চৌকাঠের উল্টোদিক থেকেই একটা কাঠের সিঁড়ি ক্রমশ নীচের অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

ফাদার ডেংপোর হাতে রণজয়ের টর্চের ব্যাটারিটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। সেই টর্চের আলো ফেলেই কিছু আগে দেখা গেল বেসমেন্টের ঘরের অন্ধকারে মিশে যাওয়া সিঁড়ির প্রত্যেকটি পাটাতনে রক্তের কালচে ছোপ। টর্চলাইটের আলোর এমন দুরাবস্থা দেখে মিঃ দত্ত নিজের কিটব্যাগ থেকে একটা মোমবাতি বের করে আলো জ্বালিয়ে পলাশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

মোমবাতির কাঁপতে থাকা হলদেটে আলোয় সেই করিডর, বেসমেন্টের ঘরের নিকষ কালো অন্ধকার, ওদের প্রত্যেকের মুখ কী ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল।

পলাশ আর দেরি না করে রণজয়কে নিয়ে বেসমেন্টের সিঁড়িতে পা বাড়াতেই মিঃ দত্ত দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। মনের ভুলও হতে পারে কিন্তু এক মুহূর্তে রণজয়ের যেন মনে হল মিঃ দত্তের ঠোঁটের কোলে অদ্ভুত এক হাসি ঝুলে রয়েছে।

দরজাটা বন্ধ হতেই ঘরের ভেতরের তীব্র কটু বিশ্রী বাতাসটা ভারী হয়ে ওদের ফুসফুসের ওপরে চেপে বসল।

— একী ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ!

পলাশ খুব সাবধানে ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। ওর পিছনে পিছনে রণজয়।

কাঠের পাটাতনে ভারী শরীরের চাপ পড়ার ফলে একটা মচমচ শব্দ তৈরি হল। রণজয় ভয় পেল। এই প্রগাঢ় অন্ধকার কি এই ক্ষীণ মোমবাতির আলোয় দূর করা সম্ভব? বেশ কয়েকটা ধাপ নামার পরেই পায়ের নীচে দু'জনেই শক্ত মাটির ছোঁয়া পেল। নাহ! টর্চ লাইটখানা আনলেই ভালো হত। এই ক্ষীণ

আলোয় সত্যি কিছু দেখা যাচ্ছে না।

— “আমাদের কালবৃত্তের নক্সাটা খুঁজে বের করতে হবে রণ। ওটা এখানেই কোথাও একটা আছে। ওটার মাঝে বসেই শিমরা নরকদ্বার...” কথাটা শেষ করতে হল না তার আগেই অন্ধকারে কীসে যেন হোঁচট খেল পলাশ। ভাগ্যিস রণজয় ওর হাতখানা চেপে ধরল। নাহলে তো মুখ থুবড়ে পড়ত।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জিনিসটার দিকে দৃষ্টি গেল ওদের। এক মুহূর্তের জন্য এক শীতল আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল ওদের দু'জনের মেরুদণ্ড দিয়ে। একটা আধগলা পোকা ধরা কাটা মুণ্ডু তাদের দিকে হাঁ করে যেন তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত লাগল দু'জনেরই সেই প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটাতে। আর তারপরেই বেসমেন্টের ঘরের পুরো মেঝের দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। আর সাথে সাথে গা গুলিয়ে পেটের ভেতর থেকে একটা বমি ভাব বেরিয়ে এল যেন।

ঘরের মাঝখানের মাটি এলোমেলো ভাবে ডাঁই করা। একদিকে কোদাল কুড়ুল আরও নানান মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম। কিন্তু এসব ছাপিয়ে একাধিক পচা গলা হাত, পা, মাথা শরীরের বিভিন্ন অংশ একটা আধবোজা গর্তের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। আর সেই পচা গলা দেহাংশের ওপরে পোকা, মাছি গিজগিজ করছে। পলাশ বুঝতে পারল ওই গর্তই হল কালবৃত্তের কেন্দ্রস্থল। ওই কেন্দ্রেই নরকদ্বার খোলা হয়েছে।

একমুহূর্ত দেরি না করে পলাশ মোমবাতিটা রণজয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলো। রণজয় সেই ঘৃণ্য জিনিসটা থেকে যতটা সম্ভব চোখ সরানোর চেষ্টা করছে। কারণ সে যতবার জিনিসটা দেখছে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠছে তার।

কিন্তু এইভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে তো চলবে না। পলাশকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে।

রণজয় দেখল ওদিকে পলাশ ততক্ষণে বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে সেই গর্তের কিনারে। তারপর দুই হাতের মধ্যমা সেই গর্তের পচা মাংসরসে ভেজা মাটিতে ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করছে ও। অজানা, অভেদ্য সেই মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে গমগম করে উঠল ঘরের প্রতিটি কোণ।

মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে একটা সবুজ আভা পলাশের হাতের মধ্যমা থেকে মিশে যাচ্ছে মাটিতে। পলাশের কি সকলমন্ত্রই মনে পড়ে গিয়েছে? রণজয় নিজের ওপরে অত্যন্ত বিরক্ত হল। তাহলে তার নিজের কেন কিছু মনে পড়ছে না? কিন্তু এই ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ পায়ের নীচের মাটিটা আচমকাই গুড়গুড় করে কাঁপতে শুরু করেছে।

চমকে উঠল রণজয়। পলাশও আচমকা মাঝপথেই মন্ত্রপাঠ থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একী! ওর চোখে মুখে এমন আতঙ্ক কেন? মোমবাতির আলোর আর প্রয়োজন পড়ছে না।

পলাশের দেহ থেকে নির্গত সবুজ আভা সারা মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কালবৃত্তের সাঙ্কেতিক চিহ্নকে জাগিয়ে তুলেছে। আর সেই নক্সা থেকে বেরোনো সবুজ আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পলাশের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেঝের ওপর তৈরি হওয়া উজ্জ্বল সবুজ কালবৃত্তের নক্সার ওপরে নিবন্ধ। কিন্তু পলাশকে এত আতঙ্কিত লাগছে কেন?

— "কীরে? কী হয়েছে?" রণজয় একহাতে পলাশের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল। পলাশ চোখ তুলে তাকাল, আর তারপরেই ঠোঁটের ফাঁক থেকে যে কথা বেরিয়ে এল তা শুনে এই প্রবল ঠান্ডাতেও ঘেমে উঠল সে।

— "নরকের দ্বার বন্ধ করা যাবে না রণ। লাকুনেরা নরকদ্বারের আগল ভেঙে দিয়েছে। এই দ্বার বন্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।"

— "তাহলে উপায়?" ভয়ে বিস্ময়ে রণজয়ের গলা থেকে আওয়াজই বেরোচ্ছে না।

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল পলাশ। রণজয় দেখল সবুজ আগুনে পলাশের চোখটা চিকচিক করে উঠছে অচিরেই। পলাশ কি কাঁদছে?

— "আমায় নরকে যেতে হবে রণ। ওখানে না গেলে নরকদ্বার বন্ধের উপায় জানা যাবে না কিছুতেই।"

— "কীসব বলছিস তুই?" ঘরের ভারী বাতাসে রণজয়ের অশান্ত স্বর ছড়িয়ে পড়ল, "তুই কি জানিস না নরকে যেতে গেলে..."

— "আমাকে মরতে হবে।" পলাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেই

কালবৃত্তের নক্সার দিকে, "আর আমায় মারবে অন্য কেউ না। তুই।"

— "কী?"

— "হ্যাঁ, ঠিক শুনছিস। তুই যে আমায় মারবি এটা বহু আগেই দেখেছিলাম। সেই শিউলিদের বাড়িতে প্রথম যেদিন লাকুনকে দেখতে পেয়েছিলাম, সেদিনই দেখেছিলাম তুই তোর দুই হাত দিয়ে আমার গলা টিপে ধরেছিস। সেই দৃশ্য ভবিষ্যতেরই ছিল। আর দেরি করিস না রণ। ওপারের কেউ বুঝতে পেরে গেছে নরকদ্বার খোলা। এই দ্বার বন্ধ না করতে পারলে কী কী বেরিয়ে আসবে সেই কল্পনা তুই করতে পারবি না। ওদের বেরিয়ে আসার আগেই আমায় ওখানে পৌঁছতে হবে।"

* * * * * * * * * *

মিঃ দত্ত আর ফাদার ডেংপো অন্ধকার করিডরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। টর্চলাইটের আলোটা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও দ্রুতগতিতে ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল। বাইরে শোঁ শোঁ করে বয়ে চলা ঠান্ডা হাওয়ার শব্দ এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। ফাদার ডেংপো ভালো করে চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। আর ঠিক তখনই আচমকা টর্চের আলোটা দপদপ করে কেঁপে উঠে নিভে গেল। ভ্রূ কুঁচকে ফাদার ডেংপো টর্চটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন। বাঁ হাতের তালুর ওপরে ঠুকতে লাগলেন। যদি কোনোভাবে জ্বলে ওঠে আলোটা। এই অন্ধকারে এই ভয়ঙ্কর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি?

আর ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন ফাদার। করিডরের শেষ মাথা থেকে একটা চাপা স্বর ভেসে আসছে। অন্ধকারেই দেখা গেল একখানা লম্বা কালো ছায়াশরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ফাদার দুই হাতে টর্চের আলোটা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করছেন, "ওহ গড! প্লিজ সেভ আস।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আছমকা টর্চের আলোটা জোরে জ্বলে উঠল। আর সেই আলো গিয়ে পড়ল সেই ভয়ঙ্করীর মুখের ওপর। হ্যাঁ, শিমরার মেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তার চোখে ঘৃণা আর মুখে নরকের ক্ষুধা।

(৯)

।। বালামের পুত্র।।

মাটির ওপরে চিত হয়ে থাকা পলাশের দেহটা নিথর হয়ে এলেও রণজয় তার বুকের ওপরে বসে রইল। হাতদুটো সাঁড়াশির মতো তখনো গলার নলির ওপরে শক্ত হয়ে চেপে বসা। ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসা চোখগুলো যেন এখনো রণজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ, পলাশ মারা গিয়েছে। ওর নিথর মৃতদেহর ওপরে বসে রণজয় এতক্ষণ সেটাই সুনিশ্চিত করেছে। কিন্তু আর তো সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে ক্রমশ। মাটির ভেতর থেকে উঠে আসা সেই অলৌকিক সবুজ আলোকছটা সরাসরি রণজয়ের মুখের ওপরে পড়ছে। একবুক ভাঙা কষ্টের ঢেউ যেন গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। একটা কান্নার দমক এই মুহূর্তেই আছড়ে পড়তে চাইছে এই বেসমেন্টের ঘরের আনাচে কানাচে। কিন্তু তার যে এখন শোকের সময় নেই। তার যে এখন কাঁদতে মানা।

সে পলাশের নলির ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই দেখতে পেল একটা লাল দাগ পলাশের গলার ওপরে গাঢ় হয়ে বসেছে। তার হাত কাঁপছে। পা টলছে। তার নিজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, সে পলাশকে খুন করল এইভাবে। কিন্তু না, এখানে বেশিক্ষণ এইভাবে বসে থাকা চলবে না। সে পলাশের খোলা চোখ জোড়া টেনে আর খোলা মুখটা চেপে বন্ধ করে দিলো। তারপর কপালে একটা স্নেহের চুমু এঁকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

রণজয় মনের ঘরে যাবতীয় আবেগকে তালা মেরে তার পরবর্তী কর্মসূচী

ঠিক করে নিলো চটপট। পলাশ মরবার আগে বলেছিল, সে চেষ্টা করবে ফিরে আসতে। কিন্তু তার জন্য লাকুনদের হাত থেকে তার এই মৃতদেহটাকে অক্ষত রাখতে হবে রণজয়কে। একবার লাকুনেরা যদি পলাশের এই মৃত শরীরের সন্ধান পায় তাহলে তারা এই দেহ ছুঁয়ে এই দেহকে নষ্ট করে দিতে চাইবেই, যাতে পলাশের আত্মা দেহহীন হয়ে নরকেই আটকা পড়ে থাকে চিরকালের জন্য। আর নরকদ্বারের ওপরেই নরক দ্বাররক্ষীর মৃত্যুতে সেই ভাঙা দ্বার আরও প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার কথা। জেনে বুঝেই এটুকু ঝুঁকি পলাশকে নিতে হয়েছে। সরাতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি পলাশের দেহ এখান থেকে সরাতেই হবে।

কিন্তু ওকী? কালবৃত্তের সবুজ আভাটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না? তার মানে... তার মানে কি কেউ বেরিয়ে আসছে ওই দ্বার দিয়ে?

একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ছে রণজয়ের মনের ভেতরে। সে ঝটপট পলাশের নির্জীব ভারী দেহটাকে তুলে কাঁধের ওপরে ফেলল। এছাড়া যে তার উপায় নেই। পলাশের কম ওজন নয় মোটেও। কিন্তু এটুকু ভার তাকে বহন করতে হবে। সে ঝটপট কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। সিঁড়ির কাঠের পাটাতন মচমচ করে উঠল একসাথে জোড়া দেহের ভারে। ওপরে ফাদার ডেংপো আছেন। উনি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন। সে চটপট পা চালাল। ওদিকে ঘরের মেঝের সবুজ আভা তীব্র হচ্ছে। তার মানে কেউ নরকদ্বার পার হচ্ছে? হা ঈশ্বর!

— "ফাদার! ফাদার ডেংপো! দরজা খুলুন।" সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে দরজায় একহাত দিয়ে কোনওরকমে দরজা ধাক্কা দিল রণজয়। "ফাদার শুনতে পাচ্ছেন...? ফাদার দরজা খুলুন। কী ব্যাপার ফাদার... প্লিজ দরজাটা খুলুন।" মরিয়া হয়ে রণ চিৎকার করে উঠছে। কিন্তু হায়! উলটোদিক থেকে দরজা খোলার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে উজ্জ্বল সবুজ আভায় আলোকিত কালবৃত্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একাধিক কালো কালো আধপোড়া হাত, পা, মাথা। ওই ... ওই যে লাকুন বেরিয়ে আসছে... একটা নয়। অনেকগুলো। দলে দলে।

* * * * * * * * * *

একটা বিকট কটুগন্ধ আচমকা কীভাবে যে শ্বাসের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকের ভেতরে ঢুকে গেল, সেটা বুঝে ওঠার আগেই একটা প্রবল কাশির দমকে সটান উঠে বসল পলাশ।

নাহ! বাতাস বড্ড ভারী হয়ে উঠেছে। শ্বাস কিছুতেই নেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কীভাবে সে মুক্তি পাবে এই কটু ভারী বাতাস থেকে? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। একটা নিশ্ছিদ্র ঘন কালো অন্ধকার যেন ঠিক তার চোখের সামনেই ঝুলে রয়েছে। নাহ! কাশিটা কিছুতেই থামছে না।

পলাশ কিছুক্ষণের জন্য দম আটকে বসে থাকতে চাইল। এই বিশ্রী বাতাসটা ফুসফুসে যাচ্ছে বলেই হয়তো এই কাশির দমকটা গলা ঠেলে উঠে আসছে। একটু বিশুদ্ধ বাতাস পেলে বেশ হত। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ নিঃশ্বাস আটকে রেখে সে অন্ধকারে চুপটি করে বসে থাকবে। এইভাবে নিঃশ্বাস আটকে বসে থাকলে তো তার মৃত্যু অবধারিত...

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা কথা, একটা মুখ, একটা দৃশ্য তার মনের ভেতরে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ধাক্কা মারল।

একটা অন্ধকার বেসমেন্টের ঘরের এবড়ো খেবড়ো অসমান মেঝেতে অলৌকিক ভাবে সবুজ রঙের আলোয় জ্বলে উঠেছে কালবৃত্তের নক্সা। আর সেই নক্সার মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে। একটানা প্রবল ঝগড়া অশান্তির পর রণজয় তার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পলাশ একবার মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বলে উঠল, "রণ! প্লিজ।"

পরের দৃশ্য ভেসে উঠল যেন চোখের সামনে। রণজয় তার বুকের ওপরে চেপে বসেছে। তারপর হাতদুটো বাড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরেছে তার গলা। মুহূর্তের মধ্যেই রণজয়ের শক্ত বুড়ো আঙুল চেপে বসেছে পলাশের নলিতে। দমবন্ধ হয়ে পলাশের কাশির দম বেরিয়ে এল যেন। মাথার ভেতরে যত অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে ততই যেন পলাশের গলায় চেপে বসছে রণজয়ের শক্ত আঙুলগুলো।

উফ বিকট ধোঁয়াটা ফের ফুসফুসে ঢুকে গেল যেন। কাশতে কাশতেই পলাশের মনে পড়ল চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা দৃশ্যের মধ্যে

রণজয়ের ঝাপসা হয়ে যাওয়া মুখ। আচ্ছা ওই চোখে কি জল ছিল? ঠিক এমন সময়ই যেন মনে হল সে একটা নরম চ্যাটচেটে জিনিসের ওপরে বসে আছে না? কী এটা? একটা টর্চলাইট পেলে ভালো হত। ঘন অন্ধকারে কোথায় এসে পৌঁছেছে সে তো নিজেই বুঝতে পারছে না। আচ্ছা? সে ঠিক মুহূর্তে মনে মনে নরকরাজ বালামের নামটা আউড়াতে পেরেছিল তো? সে নিজে নরকদ্বাররক্ষী হলেও এই অভিজ্ঞতা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। নরকদ্বার কীভাবে পার হতে হয় এই উপাচার পুঁথিগতভাবে আয়ত্ত করলেও এর ব্যাবহারিক প্রয়োগের কিছু নিয়ম আছে। প্রয়োজন ব্যাতীত কেউ কিছুতেই নরকদ্বার পার হতে পারে না। স্বয়ং দ্বারের রক্ষীও নয়। পলাশের এর আগে নরকদ্বার পার হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি আজও পড়তো না যদি নরকদ্বার সুরক্ষিত থাকতো।

আচ্ছা সে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে তো? উপাচারে সামান্য ভুল হলেই চিরকালের জন্য আটকা পড়ে যেতে হবে অন্যলোকে। অন্য কোথাও। সে কিছুই বুঝতে পারছে না কোথায় এসে পৌঁছল। একটা আলো..। একটা টর্চলাইট পেলে বেশ হত।

কথাটা ভাবতে যতক্ষণ। পলাশ অনুভব করল আচমকা তার পকেটটা যেন ভারী হয়ে গিয়েছে। পলাশ এক মুহূর্ত দেরি না করে পকেটে হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে এল একটা লম্বা টর্চলাইট। সাথে সাথে সুইচ অন করতেই একটা সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে। আর সেই আলোয় দেখা গেল ঘরের মেঝে রক্তে ভিজে চটচটে কাদায় পরিণত হয়েছে।

আঁতকে উঠে পলাশ ঘরের চারিদিকে টর্চলাইটের আলো ফেলল। কিন্তু সেই আলোর বিস্তার বেশিদূর হল না। একটা সাদা ভারী ধোঁয়া গোটা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই ধোঁয়া টর্চের আলো কিছুতেই ভেদ করতে পারছে না। একটা সাদা রঙের অভেদ্য পর্দা তৈরি হয়েছে তাকে ঘিরে। এটা কোন জায়গা? পলাশ কিছুই বুঝতে পারছে না। এখান থেকে বেরতে হবে। এই ভারী ধোঁয়ায় এভাবে বেশিক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকা যাবে না।

সে উঠে দাঁড়াতেই দেখল, তার সারা গা, হাত পায়, পোশাক কালো কাদায় মাখামাখি। টর্চের আলো ওপরে ওঠাতেই দেখা গেল মাথার ওপরের

কাঠের ছাদ অনেকটা নীচুতে। আচ্ছা এরকম নীচু কাঠের ছাদ সেই বেসমেন্টের ঘরের ছিল না? সে কি বেসমেন্টের ঘরেই আছে? সিঁড়িটা কোথায়? পলাশ টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে ফেলতে লাগল। কিন্তু আগের মতোই কিস্যু দেখা গেল না।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আচমকা টর্চের আলোটা নিভে গেল কোনরকম পূর্ব ইঙ্গিত না দিয়েই। কী ব্যাপার? এতক্ষণ তো ভালোই জ্বলছিল। পলাশ হাতের চেটোতে বারবার করে টর্চটা ঠুকতে লাগল যদি আলোটা জ্বলে। কিন্তু চিক চিক করে দু-তিনবার আলো বিকিরণ করা ছাড়া আর কিছুই হল না। অন্ধকার ঘরে পলাশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতেই পেরেছে সে মৃত্যুর পর সে পুনরায় বেসমেন্টের ঘরে এসেই হাজির হয়েছে। কী করবে সে এবার? আগের কটুগন্ধটা ধীরে ধীরে যেন হালকা হচ্ছে। নাহ! এই অন্ধকারে এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। তাকে বেরোতে হবে এই ঘর থেকে। আচ্ছা বেসমেন্টের ঘরের সিঁড়িটা যেন কোনদিকে ছিল? বামদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছিল না? পলাশ অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ঘরের বাঁদিকে এগোতে লাগল।

কিন্তু বেশি এগোতে হল না, আচমকা পলাশের মনে হল ঠিক তার পেছনদিকে একটা উজ্জ্বল সবুজ আলো যেন জ্বলে উঠল। চমকে উঠে পেছন ঘুরতেই জিনিসটা নজরে পড়ল পলাশের। কাদামাটির ভেতর থেকে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের আলো বিকিরণ করতে করতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে কালবৃত্তের সঙ্কেত।

এই তো নরকদ্বার। ঠিক যেন উজ্জ্বল সবুজ রঙের আলপনা। আর সেই উজ্জ্বল সবুজ আলোয় অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ঘরের প্রতিটি কোণে। আলোআঁধারি মেশা সেই ঘরের ধোঁয়ার আস্তরণ যেন অলৌকিক মন্ত্রবলে ক্ষণিকেই উবে গিয়েছে। ঘরের প্রতিটি কোণ এখন স্পষ্ট না হলেও পলাশ বুঝতে পারল তার আন্দাজ ঠিক। সে সেই বেসমেন্টের ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে।

পলাশ কী একটা যেন ভাবছিল। হঠাৎ সেই ভাবনায় ছেদ পড়ে আতঙ্কের একটা শিহরণ বয়ে গেল পলাশের মেরুদণ্ড দিয়ে। দুই কাঁধের ওপর বরফ শীতল

হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সে। ভুতুড়ে সবুজ আলোয় সে দেখল অন্ধকার ফুঁড়ে একজোড়া কাদা মাখানো কালো হাত তার দুই কাঁধের ওপরে কেউ রেখেছে পেছন দিক থেকে। সাথে সাথে ছিটকে উঠল সে।

আর তখনই তাকে দেখতে পেল। সেই আবছা সবুজ আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা লম্বা ছায়াশরীর। কালো লম্বা পা অবধি লোটানো আলখাল্লা, মাথায় টাক, লোমহীন সারামুখ মৃতদেহের মতো ফ্যাটফেটে সাদা। ভ্রূহীন দুচোখে সবুজ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। আর সেই আলোয় নরকের যাবতীয় ক্রূরতা জড়ো হয়েছে একই সাথে।

— "Welcome my boy! কেমন লাগছে প্রথমবার নরকে এসে?" সাপের মতো হিসহিসে স্বরটা ছড়িয়ে পড়ল বেসমেন্টের ঘরের ভারী বাতাসে।

পলাশের গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনোরকমে বলে উঠল, "আপনি কি নরকরাজ বালাম?"

— "উঁহু!" ছায়াশরীর মাথা নাড়াল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। চোখে একটা ক্রূর শঠতা, আর ঠোঁটের কোলে একটা শয়তানী হাসি ঝুলিয়ে বলে উঠল।

— "আমি বালামের পুত্র। আমার নাম... আবুধিস!"
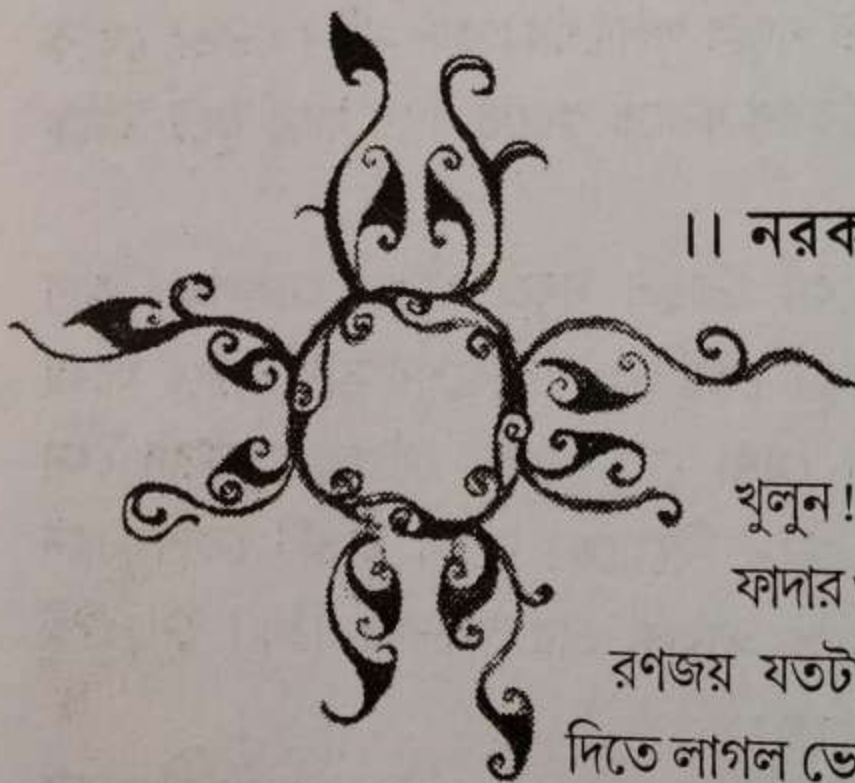
(১০)

।। নরকপারের অধিকর্তা।।

— "ফাদার... ফাদার দরজা খুলুন! ফাদার দরজা খুলুন... প্লিজ! ফাদার শুনতে পাচ্ছেন। দরজাটা খুলুন।" রণজয় যতটা জোরে সম্ভব দরজাটা ধাক্কা দিতে লাগল ভেতর থেকে। একটা আর্তচিৎকার ঘরের চামড়া পোড়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে খুব দ্রুত। কিন্তু ওপার থেকে কোনো সাড়া এল না।

ওদিকে রণজয়ের কাঁধটা টনটন করে উঠছে। আর কতক্ষণ সিঁড়ির মাথায় এইভাবে পলাশের ভারী দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তাঁর নিজেরও জানা নেই। চিৎকার করতে করতেই রণজয় কোনওরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ভৌতিক সবুজ আগুনের ছটায় পুরো ঘরটা আলোকিত। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে লাকুনের দল ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। সবুজ আলোকদ্বার থেকে তখনও পিঁপড়ের আকারে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে সেই ভয়ঙ্কর নরকজীবেরা। বিশ্রী চামড়া পোড়া কটূগন্ধ আরও ভারী করে তুলছে বাতাস।

রণজয় আরও জোরে জোরে ধাক্কা মারল। দরজায় আওয়াজ পেয়েই লাকুনেরা হামাগুড়ি দেওয়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। কী করবে এবার সে? ফাদার যদি না দরজা খোলেন তাহলে সে আর পলাশ তো এইভাবেই শেষ হয়ে যাবে! আর ঠিক তখনই একটা চিন্তা তাঁর মাথায় ঝিলিক মারল। আর তারপরেই শীতল ভয়ের অনুভূতি স্নায়ু বিকল করে দিলো যেন। ফাদার বেঁচে আছেন তো? নাকি মিঃ দত্তের নাম ভাঁড়ানো শিমরার ছেলে তাঁকে শেষ করে দিয়েছে? হে ঈশ্বর! রক্ষা করো!

না এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। ওই ... ওই যে লাকুনেরা ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। কয়েকটা মাত্র ধাপ! তারপরেই সব শেষ।

রণজয় উপায় না দেখে যে কাঁধটা খালি সেটা দিয়েই ধাক্কা মারতে লাগল কাঠের দরজায়। জোরে। খুব জোরে। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে। পলাশের ভারী দেহটা আরও ভারী হয়ে কাঁধের পেশী ছিঁড়ে দিচ্ছে যেন। উগ্র গন্ধে রণজয়ের মনে হচ্ছে সে এখনই জ্ঞান হারিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবে যেন। সবুজ আলোয় লাকুনদের হাত আর কয়েক ফুট দূরেই ওদের থেকে আর তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

একদম প্রথমে থাকা লাকুনের উল্লাসিত গোঙানি আর কালো হাত যখন আর একফুট দূরেও নয় ঠিক তখনই শেষ ধাক্কাটা দিলো রণজয়। আর সাথে সাথে দরজাটা খুলে যেতেই হুড়মুড় করে অন্ধকার করিডরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রণজয়। অন্ধকারেই ছিটকে গেল পলাশের নিথর দেহটা।

ওদিকে বেসমেন্টের ঘর থেকে মায়াবী সবুজ আলোর কিছুটা আভা এসে পড়ছে করিডরে। ওই যে কালো কালো ছায়া বেসমেন্টেরর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। রণজয় প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ছিলে ছোড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে দু হাতে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েই ছিটকে সরে এল দরজার সামনে থেকে।

শুরু হল দুমদাম আওয়াজ। একটা ভোঁতা কেঠো আওয়াজ, আর ভয়ঙ্কর গর্জন ফাঁকা করিডরে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। উলটোদিক থেকে লাকুনেরা দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। নাহ এখানে আর একমুহূর্ত নয়। ওরা যেভাবে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে তাতে এই দরজা কিছুক্ষণেই মধ্যেই ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।

রণজয় অন্ধকার করিডোরের মেঝেতে হাতড়াতে লাগল পলাশের নিথর দেহটা। ওটা এদের সামনে থেকে সরাতেই হবে। যে করেই হোক।

ঠিক এমন সময় কী একটা ধাতব জিনিস অন্ধকারে ওর হাতে ঠেকতেই চমকে উঠল রণজয়। কী এটা? সেই টর্চলাইটটা না? রণজয় যেন অন্ধকারে বুকের ভেতরে আচমকা বল পেল।

সে তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বালাতেই টর্চের উজ্জ্বল সাদা আলো করিডরের মধ্যে উজ্জ্বল সাদা বৃত্তাকার আলো ছড়িয়ে দিলো। কে বলবে একটু আগে এই টর্চলাইটের আলোই ধীম হয়ে জ্বলছিল। কিন্তু সাদা আলোয় করিডরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখেই হৃদস্পন্দন যেন একমুহূর্তে থমকে গেল রণজয়ের। করিডরের কাঠের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর সেই রক্তের ওপরে প্রবল ধস্তাধস্তির চিহ্ন! শুধু কি ধস্তাধস্তি?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একটা ভারী কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ড্রইংরুমের দিকে। তার সন্দেহ একেবারেই ঠিক। শিমরার ছেলে ফাদার ডেংপোর খুব বড় সর্বনাশ করেছে।

রণজয় এক মুহূর্ত দেরি করল না। পলাশের নিথর দেহটাকে আবার আগের মতো কাঁধে তুলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। পালাতে হবে। এই বাংলো ছেড়ে পালাতে হবে। পলাশের দেহটাকে অক্ষত রাখতেই হবে তাকে। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে ফাদার ডেংপো কোনোভাবে বেঁচে আছেন কিনা! উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন।

ওদিকে কাঠের দরজাটা মচমচ করে উঠছে। যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে এই দরজা। রণজয় আর এক মুহূর্ত দেরি না করে করিডর বরাবর তাড়াতাড়ি পা চালাল। ভারী শরীরের বোঝা নিয়ে ছোটা অসম্ভব।

সরু করিডরটা ছাড়িয়ে বড় হলঘরে আসতেই দৃশ্যটা তার নজরে পড়ল। একটা কালো চাদর ঢাকা দেহ ঠিক হলঘরের মেঝেতে ধুলো মেখে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আর একটা কাঠের ধারালো ফালি পুরো পিঠের মাঝখান এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কালো চাদর চিনতে তার ভুল হওয়ার কথা নয়। ফাদার ডেংপো!

একটা অজানা ভয় ধীরে ধীরে গ্রাস করছে রণজয়কে। সে তাড়াতাড়ি পড়ে থাকা দেহটার কাছে ছুটে গেল। যদি এখনও ওদেহে প্রাণ অবশিষ্ট থাকে? যদি এখনও কোনভাবে ফাদারকে বাঁচানো যায়? উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে তার হাতের পায়ের পেশী।

পলাশের দেহটাকে কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে সে দেহটাকে ঘুরিয়ে যেই টর্চের সাদা আলোটা মুখের ওপরে ফেলল, ওমনি সারা শরীর প্রবল আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল।

— "এ কে?" ভয়ে বিস্ময়ে রণজয়ের মুখের ভেতরে কথা জোগালো না। এ তো ফাদার ডেংপো নন। এ... এ তো মিঃ দত্ত।

হ্যাঁ। সেখানে পড়েছিল মিঃ দত্তের দেহ। যার পেটের আর পিঠের মধ্য থেকে একটা তীক্ষ্ণ কাঠের ফালা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ছিল। ঠিক এমন সময় অন্ধকারে পেছন থেকে একজন হেসে উঠল। "খিঁক খিঁক খিঁক খিঁক খিঁক খিঁক!"

এই বুকের রক্তজল করা হাসির শব্দ তার চেনা। চমকে উঠে পেছনদিকে টর্চের সাদা আলোটা ফেলতেই যেন জমে গেল রণজয়ের সব অনুভূতি। দেখা গেল ঘরের মাঝখানে থাকা ঝাড়বাতির খাঁচায় পা গলিয়ে উলটো হয়ে দোল খাচ্ছে সেই ভয়ঙ্করী। শিমরার মেয়ে। ফ্রুই সাতানাস। কিন্তু এখন আরও বীভৎস আরও ভয়ঙ্কর লাগছে ওকে।

হাসি মাঝপথে থামিয়েই সে পিশাচিনী হিসহিসে গলায় বলে উঠল,

— "কাকে খুঁজছিস? ফাদার ডেংপোকে? খিক্ খিক্!"

আর এমন সময় সদর দরজার কাছে এক মচমচে শব্দ শুনে চমকে উঠে

সেদিকে তাকাতেই একটা লম্বা দেহ দেখতে পেল রণজয়। টর্চের আলো ফেলতেই যা দেখল তাতে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ফাদার ডেংপো! একদম সুস্থ সবল।

কিন্তু এ কোন ফাদার ডেংপো? নারকীয় পাপ, আর ঠোঁটের কোলে শয়তানি হাসি মাখা এই পাদ্রীকে সে চেনে না।

* * * * * * * * * *

পলাশ অবাক হয়ে সেই ছায়াশরীরের চোখের দিকে তাকাল। মণিবিহীন সেই চোখের পুরোটা কালো। কালবৃত্তের সবুজ আলোর প্রতিফলন সেই কালো চোখেও স্পষ্ট। পলাশ বোঝার চেষ্টা করছে। বালামের পুত্র। বালামের আবার কোনো ছেলে ছিল নাকি? নিজের মনেই এসব ভেবে অন্যমনস্ক হচ্ছিল পলাশ। হঠাৎ যেন তার ঘোর কাটলো।

— "তো... কেমন লাগছে প্রথমবার নরকে এসে? যদিও আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি সত্যি সত্যি এখানে চলে আসবে।" ছায়াশরীরটি আগের মতই ফ্যাসফ্যাসে স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল।

— "আপনি জানতেন আমি আসব?"

— "হম।" ছায়াশরীরটি মাথা নাড়াল, "নরকদ্বার খুলেছে, আর নরকদ্বার রক্ষী নরকে আসবে না সেটা কখনও হয়?"

লোকটির কথা শুনে চমকে উঠল পলাশ। "আপনি জানেন নরকদ্বার খোলা হয়েছে?" বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল পলাশ। সে ভেবেছিল নরকদ্বার যে খোলা হয়েছে তা এনাদের অজানা।

— "হ্যাঁ, জানি।"

— "ওটা বন্ধ করা দরকার। এই মুহূর্তেই ওটা বন্ধ করে দিন প্লিজ। নাহলে..." পলাশের কথা শেষ হল না তাঁর আগেই ছায়া শরীরটি বলে উঠল, "ওটা তো বন্ধ করা যাবে না। ওর আগল ভেঙে দিয়েছে তোমারই জগতের লোক।"

— "হ্যাঁ মানছি কিন্তু... ওই দরজা বন্ধ না হলে লাকুনেরা যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করছে আপনার বাবার বিরুদ্ধে সেটাতে সফল হয়ে যাবে।"

— "ষড়যন্ত্র? কী ষড়যন্ত্র?" বালামের পুত্রের ভ্রূহীন কপাল যেন কুঁচকে উঠল। ঠোঁটে যদিও আগের হাসিই ঝুলছে।

— "হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র! ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! নরকজীব লাকুন আপনার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসন আরোহণ করতে চায়।"

— "হা হা হা হা!" কথাটা শোনামাত্র অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল পড়ল বালামপুত্র। সে হাসি যেন কিছুতেই থামতে চায় না। যেন ভারী মজার কিছু শুনিয়েছে পলাশ। একটানা বেশ কিছুক্ষণ হাসির পর মুখে হাসির রেস রেখেই সেই ছায়াশরীর বলে উঠল, "লাকুন আমার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে নরকরাজের সিংহাসনে বসতে চায়? তুমি কি পাগল হলে রক্ষী?"

পলাশের চোয়াল শক্ত হল। "আপনার মনে হচ্ছে আমি ভুল বলছি?"

— "উঁহু" বালাম পুত্র মাথা নাড়াল, "তুমি ভুল নয়। তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি জানো লাকুনেরা সকলেই পিতার কত অনুগত নরকজীব? আর তুমি তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলছ? তুমি অন্য কোনো স্বার্থ নিয়ে নরকে প্রবেশ করেছ। তাই না?"

— "আমার কী স্বার্থ থাকতে পারে?" পলাশ প্রবল বিস্ময়ে নিজের কানেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাগুলো।

— "সেটা জানি না। তবে আছে। হয়তো নরকদ্বারের আগল তোমার প্ররোচনাতেই ভেঙেছে কেউ। নইলে নরকদ্বাররক্ষী থাকাতেও দ্বারের আগল ভাঙে কীভাবে?"

সাপের মতো হিসহিসে কণ্ঠস্বরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। সেই স্বর একটা অজানা ভয় ছড়িয়ে দিচ্ছে পলাশের সারা শরীরে। একী ভয়ঙ্কর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে!

পলাশ গলার স্বর শান্ত রেখে বলে উঠল, "এ আপনি কী বলছেন? আমি তো লাকুনদের কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেটা জানতেই এখানে এলাম।"

— "লাকুনদের কীসের জন্য প্রতিরোধ করবে? ওরা তো তোমার জগতে নেই। ওরা সবাই এখানেই আছে।"

— "সকলে? সকলেই এখানে আছে?"

— "হ্যাঁ, সকলে! তুমি মিথ্যে বলছ। আর যদি এই মিথ্যের শাস্তি না পেতে

চাও তাহলে যেভাবে এসছ সেভাবেই ফিরে যাও।” শীতল কণ্ঠস্বরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

পলাশ বালাম পুত্রের কথাটা শুনে একবার মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল। সে যা দেখেছে তা কি সত্যিই মিথ্যে? তাহলে কি সে সত্যিই ফিরে যাবে?

— “কী হল? তুমি শুনতে পেলে না আমি কী বললাম?”

পরের মুহূর্তে মাথা তুলে তাকাল পলাশ। সে ধীরে ধীরে নিজের রুদ্রাক্ষের মালার প্যাঁচ খুলতে লাগল। চোখে দৃঢ়তা, চোয়াল শক্ত।

বালাম পুত্র তা দেখে বলে উঠল, “এটা... এটা তুমি কী করছ? তুমি আমার কথা শুনতে পেলে না? বললাম না চলে যাও এখান থেকে।”

পলাশ শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, “আমি জানি না কেন আপনি আমায় মিথ্যেবাদী বলছেন। কিন্তু আমি জানি আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না। আমি নিজের চোখে লাকুনদের তাণ্ডব দেখে এসেছি। তাই আমি ভুল দেখেছি সেটা হতে পারে না।” কথা বলতে বলতেই ওর হাত চলছে দ্রুত গতিতে। “আর তারপরেও যদি মনে হয় আমি ভুল তাহলে তার শাস্তি আমি বালামের থেকে নেওয়াই পছন্দ করব। তাঁর পুত্রের থেকে নয়।”

আর তাঁর পরের মুহূর্তেই যেই জিনিসটা হল তার জন্য বালামপুত্র একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মালাটা খুলে পলাশের হাতে চলে এসেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল নরকদ্বারের কাছে আর চোখের পলকে মালাটা ঠেসে ধরল সবুজ আলো ছড়ানো কালবৃত্তের সঙ্কেতের ওপর। আর সেই মুহূর্তেই একটা সবুজ আলোর বিস্ফোরণ ঘটল যেন। বাধা দেওয়ার সময়টুকুও পেল না বালামপুত্র। একটা হু হু করে প্রবল গরম হাওয়া আর আর সবুজ আগুনের স্রোত কালবৃত্তের সঙ্কেত থেকে বেরিয়ে ঘিরে ধরল পলাশকে...

— “হে নরকরাজ বালাম! আমি নরকের দ্বাররক্ষী আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি দেখা দিন। হে নরকরাজ বালাম!”

বালামপুত্র প্রবল আক্রোশে যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চায় পলাশকে। কিন্তু কিছুতেই ছুঁতে পারছে না ওকে। কারণ ঘরের মধ্যে সেই গরম হাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কুণ্ডলীর মধ্যে আড়াল করে রেখেছে পলাশকে। হঠাৎ এক জান্তব আর্তনাদ বেরিয়ে এল আলোর উৎস থেকে আর সাথে সাথে

সেই আলো আর হাওয়া একসাথে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

প্রবল আলোকছটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল পলাশের। আলোর উজ্জ্বলতা কমলে দেখা গেল একটা কালো লম্বা প্রৌঢ়ের শরীর তার সামনে দাঁড়িয়ে। ছায়াশরীরের সবটাই একজন মানুষের মতো কেবল চোখের দৃষ্টিতে নরকের আগুন জ্বলছে যেন। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে একটা শিরশিরে ভয়ে কেঁপে উঠল পলাশ। ইনিই তাহলে নরকদেবতা বালাম?

পলাশ একবার আড়চোখে তাকাল আবুধিসের দিকে। রাগ, ভয়, প্রতিহিংসার খরদৃষ্টিতে সে যেন পুড়িয়ে ফেলবে পলাশকে। কিন্তু পলাশ জানে তার এখন ভয় পেলে চলবে না। তার এখন অনেক কাজ।

* * * * * * * * * * *

— "আপনি বেঁচে আছেন?" রণজয় যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

— "কী? অঙ্কটা মেলাতে অসুবিধে হচ্ছে?" ফাদার ভারী পাওয়ারের চশমাটা খুলে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন রণজয়ের দিকে।

— "বাচ্চা ছেলে, খিঁক খিঁক খিঁক খিঁক!" সেই ভয়ঙ্করী পিশাচিনী লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নগ্নশরীরের যেটুকু আবরণ ছিল তা এতটাই কম যে রুগ্ন শরীরের বেশিরভাগটাই দেখা যাচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে ফাদার ডেংপোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা টর্চের আলো ওদের দু'জনের মুখের ওপরেই পড়ছে। আর ঠিক তখনই রণজয়ের খেয়াল হল, কী আশ্চর্য মিল এই দুই চেহারায়।

— "বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে পারছে না, কীভাবে কী হয়ে গেল। তাই না? খিক্ খিক্!"

চমকে উঠল রণজয়। কী অদ্ভুতভাবে পালটে গিয়েছে ফাদার ডেংপোর বাচনভঙ্গী। গলার স্বর, "আমিই সেই, যে লাকুনের সাহায্যে সেই রাত্রে আরিনাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম যে রাত্রে আরান রটকে পুড়িয়ে মারা হয় গির্জার মধ্যে। আমিই সেই, যে প্রতি রাতে আরিনাকে নিজের হাতে অত্যাচারিত হতে দেখি যাতে শয়তানের মুখে ভোগের রক্ত তুলে দিতে পারে

সে। আমিই সেই, যে এতদিন অপেক্ষা করেছি সঠিক সময় সুযোগের। আমিই সেই, যে আসল পাদ্রীকে খুন করে মিথ্যে পরিচয় ভাঁড়িয়ে আরিনাকে নিয়ে হাজির হই কাঞ্জাঙে। আমিই সেই, যে অর্ধসমাপ্ত উপাচারকে শেষ করে নরকের দরজা খুলে দিই যাতে লাকুনেরা বেরিয়ে 'Remotinem autem infirma' পূর্ণ করতে পারে।"

— "কিন্তু সেই পর্যটক?" রণজয় এখনও নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

— "কুসংস্কারী আর ধর্মান্ধ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সোজা, বুঝলে। পর্যটকও তেমনই একজন মানুষ ছিল। সেই রাত্রে ও যখন প্রার্থনা করতে গির্জায় এল টুক করে শুধু ওর কানে তুলে দিতে হয়েছিল বহুবছর আগের গির্জা পোড়ানোর ঘটনাটি। স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান পর্যটকটি যীশুর বিরুদ্ধে হওয়া পাপের কোনো প্রতিকার আছে কিনা জানতে চায়। আমিও ওকে পদ্ধতিটা বলে দিই। কিন্তু সেই পদ্ধতিটা আসলে কী ছিল বলতো?"

— "চতুশৃঙ্গ উপাচারের প্রথম ধাপ..." নিজের অজান্তেই রণজয়ের ঠোঁটের ফাঁক থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

— "একজ্যাক্টলি! এই তো বুঝে গিয়েছ।" একটা শয়তানি হাসি খেলে গেল ছদ্মবেশির ঠোঁটের কোলে।

— "এই কাজে ওকে সাহায্য করে খাইসান শেরপা। যেহেতু আমি গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাই আমি খুব ভালো করে জানতাম কার অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম। খাইসানদের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে করুণ ছিল। সেই পর্যটক নিজের ধর্মের মান রক্ষা করতে খাইসানকে প্রচুর টাকার লোভ দেখায়। প্রথমে নিষিদ্ধ জায়গায় যেতে গাঁইগুঁই করলেও টাকার পরিমাণ দেখে টোপটা ও গিলেই নেয়। পর্যটক এইখানে আসে, আর আমার নির্দেশ মতো নিজের অজান্তেই খুলে দেয় নরকদ্বারের দরজা। শয়তান লাকুন বেরিয়ে এসে প্রথমেই বলি নেয় পর্যটকের। তারপর খাইসানের দেহে প্রবেশ করে গ্রামে ফিরে তাণ্ডব চালায়। ভয় পেয়ে ওরা তান্ত্রিকদের ডাকে। আর খাইসানকে ওই জায়গায় জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত

এটাও আমারই পরামর্শ ছিল। আমিই তান্ত্রিকদের জানিয়েছিলাম এইভাবে কাজটা করতে পারলে এই শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বোকা তান্ত্রিকের দলও আমার প্ররোচনায় পা দেয়। আর নিজেরাই শয়তানের বলি হয়ে নরকের আগল ভেঙে দেয়।"

— "তাহলে মিঃ দত্ত...?"

— "উনি প্রকৃতই অকালিস্ট ছিলেন। কিন্তু ওনার নামে তোমাদের মন বিষাক্ত না করলে তোমরা তো ওর থেকেই সাহায্য নিতে। আর সেটা কী করে মেনে নিই বলতো? তাই তোমাদের মন ওর প্রতি বিষাক্ত করে দিলাম। আর দেখো তোমরা দুই বন্ধু কেমন আমার কথা চুপচাপ মেনে নিয়ে বেসমেন্টের ঘরে চলে গেলে ওকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে।"

— "তোমরা ভয়ঙ্কর শয়তান।" দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে রণজয়। সে এখনো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। যাকে সে বিশ্বাস করেছিল সেই আসল বিশ্বাসঘাতক। "তোমরা খুন করেছ মিঃ দত্তকে!"

— "এখনো তো শয়তানির কিছুই দেখলেই না। এবার দেখো।" কথা বলতে বলতে ফাদার ডেংপো পরনের পোশাকটা টেনে খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই আঁতকে উঠল রণজয়। একী! এ কাকে দেখছে সে? ঢিলে ঢালা আলখাল্লার ভেতরে এক নারীর পোশাক পরিহিত নারী শরীর। চোখের মোটা চশমার ফ্রেমটা ছুঁড়ে মাথার চুলে টান দিতেই উইগটা একপাশে খুলে পড়ল আর বেরিয়ে এল একধাল সাদা চুল। একটা খনখনে মেয়েলি স্বর ভেসে এল বৃদ্ধার গলার ভেতর থেকে।

— "দেখো তো, আমায় চিনতে পারো কিনা?"

— "শিমরা!"

হাততালি দিয়ে উঠল আরিনা, "মাকে চিনেছে! মাকে চিনেছে!"

এখনো বিহ্বল ভাব কাটছে না রণজয়ের। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

— "কীভাবে সম্ভব?"

— "খুব সোজা। প্রথমে নিজের ছেলের গলা টিপে তাকে খুন করুন। তারপর নিজের পোশাক পরিয়ে তাকে বেসমেন্টেরর ঘরে নিয়ে গিয়ে গায়ে

আগুন দিয়ে দিন। তারপর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। লোকে ভাববে তুমি মরেছ।"

— "তুমি নিজের ছেলেকে খুন করেছ?"

— "তন্ত্রে কেউ কারোর না। মেয়ে জীবন্ত ভোগ তাই ওকে অক্ষত রাখতেই হত আমায়। তোমাদেরকেও খুন করতাম" কেটে কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করল শিমরা।

— "আমি তো প্রথমে বুঝতেও পারিনি তোমরাই স্বর্গদ্বাররক্ষী, নরকদ্বাররক্ষী। যখন কাঞ্জাঙের প্রেতেরা তোমাদের ওপরে হামলা করল, দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজাই নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল আরিনা যতই তোমাদের স্মৃতি ভুলিয়ে দিক না কেন আমি জানতাম তোমাদের যতক্ষণ না আলাদা করা যায় তোমাদের শেষ করা যাবে না। তোমরা আলাদা হলেই তোমাদের শক্তি কমবে। আর তখনই তোমাদের শেষ করা যাবে।"

— "কী ভেবেছ তোমরা..." প্রবল রাগে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো রণজয়, "এইভাবে আমাদের আলাদা করে আমাদের শক্তি কমবে? আমরা শারীরিকভাবে আলাদা হতে পারি কিন্তু আমাদের আত্মার যোগাযোগ। তোমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না। তোমরা যা করেছ দু'জনে মিলে তার খুব ঘৃণ্য শাস্তি পাবেই পাবে।"

— "ভয় দেখাচ্ছে..." সেই ভয়ঙ্করী কাঁদো কাঁদো হয়ে ভেংচি কাটলো রণজয়কে।

বৃদ্ধা চোখে অবজ্ঞার হাসি হেসে বসল, "তাই? দেখা যাক।"

এমন সময় ঘরের কোথাও হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ হতেই চমকে উঠল রণজয়।

শিমরা খিল খিল করে হেসে উঠল, "এবার... এবার কীভাবে বাঁচাবে নিজেকে? আর কীভাবেই বা বাঁচাবে নিজের বন্ধুর দেহ? ওই দেখো লাকুনেরা পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে নরকের দ্বার দিয়ে।"

সত্যি তো! একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেল রণজয়ের শরীর দিয়ে। লাকুনেরা ভেঙে ফেলেছে দরজা। এবার ওরা গন্ধে গন্ধে ধেয়ে আসবে তার

দিকে। কিন্তু ওর এখনো নিজের বীজমন্ত্র মনে পড়ছে না। কীভাবে বাঁচাবে সে নিজেকে আর পলাশের দেহকে।

ঠিক এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো মনে পড়ল মিঃ দত্তের সেই গির্জায় দাঁড়িয়ে বলা কথাগুলো। তাকে এই মুহূর্তে বাঁচাতে পারে একমাত্র আভে মারিয়া।

কিন্তু সে তো আভে মারিয়ার পাঠ জানে না। কী করবে সে? মাথা কাজ করছে না। না তার মাথা কাজ করছে না কিছুতেই। ঠিক এই সময়ই টর্চের আলো পড়ল দূরে পড়ে থাকা মিঃ দত্তর কিট ব্যাগের দিকে। আচ্ছা ওই ব্যাগের মধ্যেই পকেট বাইবেলটা ছিল না?

এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গিয়ে কিট ব্যাগটা হাতড়াতে লাগল রণজয়। কিন্তু একী! পকেট বাইবেলটা কোথায় গেল? এর মধ্যেই ছিল না?

রণজয়ের বিহ্বলতা দেখে হেসে উঠল দুই শয়তান। শিমরা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল, "কী খুঁজছ? পকেট বাইবেলটা? পাচ্ছ না খুঁজে?"

রণজয় অবাক। সত্যি সে পাচ্ছে না কেন জিনিসটা?

— "ওই লোকটা যখন নিজের ব্যাগটা ধরিয়ে নদীতে জল আনতে গিয়েছিল আমি তোমাদের অসাবধানতায় বাইবেলখানা টুক করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি জঙ্গলের ভেতর। হি হি হি!"

রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠল রণজয়ের। কিন্তু একই সাথে এক হতাশা যেন ঘিরে ধরল তাকে। এবার? এবার কী করবে সে? তার তো আর কোনো উপায় নেই। এই লোকটা বাইবেলখানা নদী তীরে না ছুঁড়ে দিলে... রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল রণজয়ের। তারা কী এমন কথা বলছিল যে গোটা ব্যাপারটা তাঁদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল...

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা কথা বিদ্যুৎ ঝিলিককের মতো মনে পড়ল তার। পলাশ তাঁর পকেটের মধ্যে কী একটা ঢুকিয়ে বলেছিল না, "যদি কখনও মনে হয় তোর কাছে আর কোনো উপায় নেই। তখনই এটা বের করিস। তার আগে নয়।"

রণজয় সাথে সাথে পকেট বের করে আনলো একটা দলাপাকানো কাগজের

টুকরো। এটা কী?

রণজয় টর্চের আলো ফেলতেই একটা পোড়া গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে উঠল। ওই যে... ওই যে হুড়মুড় করে লাকুনের দল করিডর ছেড়ে ড্রইংরুমে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই ওদের বিকট পোড়া গন্ধে ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শিমরা চিৎকার করে উঠল ওদের দেখেই, "মেরে ফেলো, মেরে ফেলো ওদের। শেষ করে ফেলো।"

কিন্তু ও কী? রণজয় কী দেখছে এত একাগ্র হয়ে। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি আর টর্চের আলো সেই কাগজের পাতার ওপর নিবন্ধ। একটা বইয়ের ছেঁড়া পাতা আর তাতে লেখা একটা স্তোত্র।

কাগজের উলটো দিকে পলাশের হাতে লেখা একটা ছোট্ট নোট।

— "সকল মা-ই এক। সে আদিশক্তি হোক বা মাতা মেরি। তাই আভে মারিয়াও যা আদ্যাস্তোত্রও তা। মনে রাখিস, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির লড়াই চিরন্তন। বিশ্বাস রেখে মাকে যেই ভাবেই ডাক, তিনি সাড়া দেবেনই।"

ওদিকে ধীরে ধীরে ওদের চারপাশ থেকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে বৃত্ত ছোট করছে লাকুনেরা। চোখে মুখে ক্ষুধার্ত শয়তানের লোভ। এখনই ওরা ছুঁয়ে ফেলবে পলাশের মৃতদেহ। ভয়ঙ্করী আরিনা রট হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে বলল, "মেরে ফেল। মেরে ফেল।" আর ঠিক সেই সময়ই এমন এক আশ্চর্য কাণ্ড হল, তার জন্য সকলেই এক মুহূর্তে থমকে গেল।

— "ওঁ নম আদ্যায়ৈ।
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ।।"

ঘরের ভেতরে গর্জে উঠল রণজয়ের কণ্ঠস্বর। ও আদ্যাস্তোত্র পাঠ করছে চিৎকার করে। চোখের পাতা স্থির। গলার স্বর দৃঢ়। কিন্তু এতে কী কাজ দেবে?

বৃদ্ধা ডাইনি চিৎকার করে হেসে উঠল, "হিন্দু দেবীর মন্ত্র দিয়ে এদের আটকাবি...? পারবি? ভুলে যাস না এরা অন্য ধর্মের, অন্য বিশ্বাসের অপদেব..."

কথাটা বলতে বলতেই মাঝপথে থেমে গেলে শিমরা। একটা আতঙ্কের ঢেউ ধাক্কা মারল শয়তান মা-মেয়ের মুখে।

রণজয় আদ্যা স্তোত্র পাঠ করছে কাগজ দেখে দেখে... কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবেই লাকুনেরা ছটপট করে উঠল। যেন ভয়ঙ্কর এক দহনজ্বালা শুরু হয়েছে ওদের দেহে।

'ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা'... আদ্যাস্তোত্রর এই মন্ত্রটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের প্রতিটি কোণে।

একমুহূর্ত সময় লাগল লাকুনদের পুরো ব্যাপারটা বুঝতে। কিন্তু তার মধ্যেই যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাধা ডিঙিয়ে আদ্যাস্তোত্র মারণ মন্ত্র হয়ে আছড়ে পড়েছে নরকজীবেদের ওপরে।

একী? লাকুনেরা যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। পারবে কী করে? সদর দরজায় যে মন্ত্রবন্ধকী। রণজয়ের উদাত্ত গলার স্বর থেকে ছড়িয়ে পড়া আদ্যাস্তোত্র ওদের পুড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, নরকজীব লাকুন যারা নরকের আগুন থেকে তৈরি তারা পুড়ে যাচ্ছে। শুধু পুড়ছে না, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেবীস্তোত্র সব অশুদ্ধি পুড়িয়ে শুদ্ধ করে ফেলছে চতুর্দিক।

শিমরা ও তার মেয়ে বিহ্বল। এসব কী? কী হচ্ছে এসব? এভাবে সবকিছু পালটে গেল কী করে? আর ঠিক তখনই তাঁদের দৃষ্টি গেল মন্ত্রপাঠরত রণজয়ের দিকে।

— "ওকে আটকা... ওকে আটকা" মেয়েকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল শিমরা। নির্দেশ পেয়েই দাঁত, নখ বের করে রণজয়ের দিকে ছুটে গেল আরিনা। সাথে সাথেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখ থেকে ভেসে এল এক জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। চমকে উঠল সকলে।

— "দাঁড়াও!" অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। একটা ছায়া কেবল। রণজয় সাথে সাথে টর্চের আলোটা সেই দিকে ফেলতেই শিউরে উঠল। সে যা ভেবেছিল তাই। পলাশ! দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মুখে। দুই চোখে প্রবল ঘৃণা।

— "নরকদ্বাররক্ষী হিসেবে তোমাদের দু'জনকে সাবধান করছি। এক পা ওর দিকে বাড়াবে না।"

আনন্দে রণজয়ের চোখে যেন জল চলে এল। পলাশ নরক থেকে ফিরে এসেছে? ও বেঁচে উঠেছে? কিন্তু কখন?

শিমরা পলাশকে দেখে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে উঠল, "তুই? তুই বেঁচে উঠেছিস?" তারপর এক মুহূর্ত থেমে বলল, "বাহ, খুব ভালো! কিন্তু তুই কী ভেবেছিস তুই আমাদের আটকাতে পারবি? লাকুনদের শেষ করে ফেললেও আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের তো মারতে পারবি না তোরা। কারণ আমরা এখনও জীবিত। আর জীবিত মানুষদের ওপরে তোদের ক্ষমতা কাজ করে না।"

শিমরাকে অবাক করে পলাশ মুচকি হাসল, "একদম ঠিক বলেছ। আমাদের ক্ষমতা নেই তোমাদের আটকানোর। কিন্তু একজনের আছে। দেখবে কে?"

সাথে সাথে এক উজ্জ্বল সবুজ আলোর বিস্ফোরণে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের। সিঁড়ির কাছে উজ্জ্বল সবুজ আলো মেখে ভাল্লুকের পিঠের ওপরে বসে আছে এক বিশালাকায় দেহ। তিন মাথা বিশিষ্ট সেই দানবের একটা মাথা মানুষের, একটা ভেড়ার আর একটা সিংহের। তিনজোড়া চোখেই প্রবল ঘৃণা আর রাগ। এক হাতে বাহনের গলার শিকল ধরে। অন্য হাতে রাজদণ্ড। এই হল নরকের বালামের আসল রূপ।

তাঁকে দেখে ভয়ে সাদা হয়ে গেল দুই ভাই বোনের মুখ। তিনি তাঁদের দিকে হাতের দণ্ডটা নির্দেশ করে ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জে উঠলেন, "তোরা যা অপরাধ করেছিস তার শাস্তি তোরা পাবিই। আর সেটা পাবি নরকে। রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের কী শাস্তি হয় সেটা দেখ এবার।"

পরমুহূর্তেই আরেকটা চোখ ধাঁধানো সবুজ আলোর স্রোত বেরিয়ে এল বালামের হাতের দণ্ড থেকে। একজোড়া তীব্র গগনবিদারী আর্তনাদ। মুহূর্তেই মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুই অপরাধীর নশ্বর দেহ। বালাম মা-মেয়ের আত্মাকে তাদের অপরাধের, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে চিরকালের জন্য বন্দী করে নরকে চললেন।

আলোর তেজ কমে আসতেই রণজয় দেখল সেই হলঘরে টর্চের আলো জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কিন্তু সে একলা নয় পলাশও আছে সাথে।

* * * * * * * * * * *

রণজয় আর পলাশ দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখল আকাশ ধীরে ধীরে

পরিষ্কার হচ্ছে। রাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। পূর্বদিকে একটু পরে সূর্য দেখা দেবে। ওদের পেছনে দাউদাউ করে জ্বলছে রট সাহেবের বাংলো। পলাশ নিজের শক্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই অভিশপ্ত বাড়িটা। আগুন লাগানোর আগে মিঃ দত্তের মৃতদেহ এই ঘরের ড্রইংরুমেই ওরা দু'জনে মিলে কবর দিয়েছে। বাইবেল না থাকায় গীতার যেটুকু অংশ মনে ছিল তাই রণ পাঠ করেছে ওনার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। এই রাতের পর ওর বুঝতে আর কোন অসুবিধে নেই যে বাইবেলের মর্মার্থ আর গীতার মর্মার্থ কোথাও গিয়ে একই সুতোয় বাঁধা।

বাইরে বেরোতে বেরোতে রণজয় বলে উঠল, "সবকিছু শেষ হল। তাই না রে?"

সাথে সাথে একটা দৃশ্য পলাশের মনের গহীনে ফুটে উঠল।

— "এতে করে কীভাবে প্রমাণিত হয় পিতা যে আমিই দোষী?" অন্ধকার ঘরে আবুধিস পলাশের দিকে কাদা মাখনো আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন, "এই ছেলেটি বলছে বলেই বিশ্বাস করতে হবে যে, লাকুনদের পেছনে আমিই আসল কলকাঠি নেড়েছিলাম?"

— "তুমি কি কোনো কিছু প্রমাণ দাখিল করতে পারবে যে লাকুনেরা সামনে থাকলেও এসবের পেছনে আমার ছেলে ছিল? সেই আসল কলকাঠি নেড়েছিল?" বালামের হিসহিসে কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কথাটা পলাশের উদ্দেশ্যে।

— "নাহ। আমার কাছে আর কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার অন্তর্গত জীবেরা আপনার ছেলের অনুমতি ব্যতীত নরকদ্বারের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। আর এটাই এখানকার নিয়ম। সেখানে লাকুনেরা নরকদ্বার পার হয়ে গেল এত নির্বিঘ্নে। সেটা কীভাবে?"

পলাশ দেখল তার কথা শোনার সাথে সাথেই বালামের কপালের ভাঁজ আরও গভীর হয়ে উঠল, তিনি বলে উঠলেন, "যেহেতু তোমার কাছে উপযুক্ত প্রমাণ নেই সেটা একমাত্র সময় প্রমাণ করবে রক্ষী। এখন দরকার শিমরা আর ওর মেয়েকে শাস্তি দেওয়া। তুমি ফিরে যাও নিজের জগতে।"

— "ক্ষমা করবেন পিতা।" শয়তানি হাসি বালামপুত্রের ঠোঁটের কোলে,

"আপনি বোধহয় নরকের নিয়ম ভুলে যাচ্ছেন। এখানে দাঁড়িয়ে কাউকে প্রমাণছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এই ছেলেটি আমায় প্রমাণ ছাড়া দোষী সাব্যস্ত্য করল। এর শাস্তি তো ওকে পেতেই হবে তাই না?"

একটু থেমে ফের হিসহিস করে বলে উঠল আবুধিস, "আমি নরকপারের অধিকর্তা আবুধিস তোমার থেকে চিরকালের জন্য নরকদ্বার পার হওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিলাম। এরপর তুমি কোনোদিন, কোনোভাবেই নিজে নরকদ্বার পার হতে পারবে না। যাও। এবার নিজের জগতে ফিরে যাও।"

শিউরে উঠল পলাশ। পরক্ষণেই ঠোঁটে একটা শয়তানি হাসি ঝুলিয়ে পলাশের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে আবুধিস ফের বলে উঠল,

— "আমাদের আবার দেখা হবে রক্ষী। অন্য কোথাও। অন্য সময়।"

•

পলাশ রণজয়ের প্রশ্নে মাথা নাড়াল। "হ্যাঁ। শেষ।"

ওরা লোহার গেটের বাইরে দাঁড়াতেই রণজয় চোখ বন্ধ করে কি যেন একটা স্মরণ করে ঠিক একই পদ্ধতিতে দ্বারবন্ধকী করে দিল রট সাহেবের বাংলোর লোহার গেটে। এই বন্ধকী চিরতরের জন্য বাঁধা রইল এই দরজায়। আর কোন অশুভশক্তি কোনোদিন চাইলেও এই দরজা পার হতে পারবে না।

পলাশ রণজয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। "তোর সব মন্ত্র মনে পড়েছে?"

রণ মুচকি হেসে মাথা নাড়াল। "হ্যাঁ!"

— "তাহলে তো তোর সব শক্তিও ফেরত এসেছে। তাই না?"

রণজয় দেখল পলাশের গলায় কালশিটে দাগটা কালো হয়ে বসে আছে। সে মুচকি হেসে পলাশের কাঁধে হাত রেখে বলল, "হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস। আমার সব ফেরত এসে গিয়েছে। সব।"

সিকিমের একটি শান্ত গ্রাম কাঞ্জাং এক রাত্রে হঠাৎ করেই হয়ে যায় জনশূন্য। অবশিষ্টাংশ হিসেবে পড়ে থাকে গ্রামবাসীদের গোছা গোছা চুল আর উপড়ানো নখ। পাহাড়ের শিরশিরে হাওয়ায় ভাসতে থাকে একটাই কথা, "পুরা কাঞ্জাং শাপিত হো চুকা হ্যায়"। এক আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের বাকি গ্রামগুলোতে।

এদিকে কলকাতা শহরে বসে পলাশ হঠাৎ করেই সম্মুখীন হয় একদল নরকজীবের আক্রমণের। পলাশের ডানহাতে কনুই অবধি রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। কোনো কিছু কি আড়াল করতে চাইছে পলাশ? কোথা থেকেই বা এল এই নরকজীবের দল? আর রণ! কীই বা ওর আসল পরিচয়?

বহু বছর আগের এক অভিশপ্ত ইতিহাস ফিরে আসতে চাইছে আবার। কিন্তু কেন? শুধুই কি প্রতিহিংসা!

আছে এক ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র যা বদলে দেবে সৃষ্টির ইতিহাস? 'Remotinem autem infirma' অর্থাৎ দুর্বলের অপসারণ হয়ে পড়েছে অনিবার্য। কিন্তু কেন? উত্তর খুঁজতে পলাশ বন্ধু রণজয়কে নিয়ে পাড়ি দিলো পাহাড়ে। আর মুখোমুখি হল এক ভয়ঙ্কর অভিশাপের।

বিভা
অলৌকিক
সিরিজ

ওরা কি পারবে ইতিহাসের ধুলো সরিয়ে অভিশাপের মূলে পৌঁছোতে? নরকজীবেদের আটকানোর সত্যি কি কোনো রাস্তা অবশিষ্ট আছে আর?

ISBN 978-93-86548-84-9

₹ ১২৩.০০

www.bivapublication.com